

শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাগুরী

রাহিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু

প্রবন্ধ সম্ভার-১



উর্সে হাদীয়ে যমান (রাহি.) স্মারক গ্রন্থমালা-২

গ্রন্থত্ব

হাকয়ালছড়ি দরবার শরীফের প্রাণসত্তা হাদীয়ে যমান গাউসুল ওয়াক্ত
আব্বাস কায়ী সৈয়্যদ হাকনুর রশীদ (রাছি.)'র
রওয়া শরীফ সংস্কার প্রকল্পাধীনে ন্যস্ত।

সম্পাদনা ও প্রকাশনায়

আব্বাসে তৌহীদ বতোফায়লে রশীদ

হাকয়ালছড়ি দরবার শরীফ, ভূজপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল

হাদীয়ে যমান (রাছি.)'র ৩য় বার্ষিক উরসে পাক দিবস

১১ রজব ১৪৩৫ হিজরী

২৮ বৈশাখ ১৪২১ বাংলা

১১ মে ২০১৪ ইংরেজী

মুদ্রণ তত্ত্বাবধান

আল হাকনী কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

আন্দরকিছা, চট্টগ্রাম।

মোবাইল: ০১৮১৫-৪৬০২০২

হাদিয়া

৮০ (আশি টাকা)



হাদীয়ে যমান গাউসুল ওয়াক্ত হযরতুল আব্বাস মাওলানা
কায়ী সৈয়্যদ হাকনুর রশীদ রাঈয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র

হিদায়ত-ইরশাদ মূলক বাণী

☆ খোদার খোদায়ীর মধ্যে গাউসুল আ'যম উপাধি লাভকারী ওলীমুল্লাহ
মাত্র দু'জনই; একজন হলেন- শাহানুশাহে বাগদাদ হযরত গাউসুল
আ'যম শায়খ সৈয়্যদ আব্দুল ক্বাদির জীলানী (রাছি.) এবং আরেকজন
হলেন- শাহানুশাহে মাইজভাণ্ডার হযরত গাউসুল আ'যম শাহে
দু'আলম সৈয়্যদ আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (রাছি.)। হযরত গাউসুল
আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাছি.)'র বাণী: 'বাসুল্লাহ সাহাবুল্লাহ আলাইহি
ওয়া সাল্লামার দস্ত মুবারকে দু'টি তাজ বর্ণনান্তরে টুপী ছিল; একটি
আমার মাথায় পরিয়ে দেন, অপরটি আমার ভাই পীরানে পীর শায়খ
আব্দুল ক্বাদির জীলানী সাহেবের মাথায় পরানো হয়' মর্মেও তা
সুস্পষ্ট।

☆ যারা আখিরাত চায়, তারা দুনিয়ার মোহ-মায়ায় বন্দি থাকতে পারে না
এবং যারা আব্বাসকে চায়, তারা দুনিয়া-আখিরাত কিছুই কামনা-
বাসনা রাখে না; আর আব্বাসকে পাওয়ার যুগোপযোগী উপযুক্ত পন্থাই
হলো বিভিন্ন হক্ক তুরীকাসমূহ; চলমান যুগোপযোগিতায় মাইজভাণ্ডারী
তুরীকার যথোপযুক্ততা প্রশাসিত।

☆ খোদীকে (নিজ সত্তাকে) খোদার মধ্যে বিলীন করে দেখো, তোমাতেরই
তুমি খোদা দেখতে পাবে।

সূচীপত্র

□ সম্পাদকীয়	০৬
□ হযরত গাউসুল আ'যম মাওলানা শাহ্ সৈয়দ আহমদুল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (রা.)	
১ হযরতুল্লাহজ্জ আল্লামা কায়ী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী	০৮
□ পূর্ব আকাশে রবির উদয় আঁধার হল বলয়: গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী প্রসঙ্গ	
১ হযরতুল্লাহজ্জ আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী	২১
□ গাউসুল আ'যমের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব	
১ এস এম জাফর ছাদেক আল্ আহাদী	২৭
□ হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাহি.)'র প্রশংসায়	
ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত শেরে বাংলা রাহিমাহুদ্বাহ	
১ এস এম জাফর ছাদেক আল্ আহাদী	৩৪
□ মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার সত্যতার অন্যতম নিদর্শন	
এ ত্বরীকার অনুসারীগণ মৃত্যুর পরও অমর	
১ বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর	৪৮
□ হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাহিমাহুদ্বাহ্ আনহু) যুগে যুগে প্রশংসিত	
১ তৌহিদুল আনোয়ার মুহাম্মদ আব্দুল হাই আল্ হাক্কানী	৫৩
□ দুই গাউসুল আ'যম রাহিয়াল্লাহু আনহুমা'র বীণী সংস্কার	
১ এস এম জাফর ছাদেক আল্ আহাদী	৫৭
□ মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্বা-দর্শনের সংস্পর্শে রমেশ শীলরা	
১ এস এম জাফর ছাদেক আল্ আহাদী	৬৪
□ ফুলে ফুলে ফুলন্ত গাউসে আ'যম মাইজভাণ্ডারীর ফুল বাগান	
১ বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর	৬৯

□ সুন্নিয়ত, তামাওউফ ও সামাজিক জীবনে	
গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর প্রভাব	
১ আবুল ফজল মুহাম্মদ ছাইফুল্লাহ্ সুলতানপুরী	৭৪
□ শাহানুশাহে মদীনা ও শাহানুশাহে মাইজভাণ্ডার-এর	
শাহানুশাহীর বিশেষ এক বালক	
১ এস এম জাফর ছাদেক আল্ আহাদী	৭৭
□ শাহানুশাহে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শাহানুশাহে মাইজভাণ্ডার	
রাহিয়াল্লাহু আনহু'র ইহলোকে আবির্ভাব স্মারক দিবসের এক অপক্লপ মিলন	
১ এস এম জাফর ছাদেক আল্ আহাদী	৮৯
□ জগৎগুরু মুহাম্মদ মুত্তফা (দ.) দীক্ষিত প্রেমের শিক্ষা ও সত্যপ্রেমের দীক্ষা	
নিম্নে ইমামুল আভিলিয়া গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাহি.)'র আগমন	
১ বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর	৯৩
□ হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র প্রশংসায়	
তাঁর খুলাসায় ইয়াম (রাহি.)	
১ তৌহিদুল আনোয়ার মুহাম্মদ আব্দুল হাই আল্ হাক্কানী	৯৯
□ সূত্রে সূত্রে মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্বা-দর্শন	
১ এস এম জাফর ছাদেক আল্ আহাদী	১০৩
□ গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.) ও শিখ-কিশোর	
১ মুহাম্মদ মেজবাহ উদ্দীন	১০৭
□ ইয়াহুদী হে নসারা হে হাকীকত মে বহী কমবখ্ত	
জিসে গাউসে খোদা সে কুহু বদিন ইনকার হুজাবে	
১ বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর	১১০



সম্পাদকীয়

বিস্মিত্তাহির রাহমানির রাহীম

প্রশংসা-কৃতজ্ঞতা, দুর্বাদ-সালাম ও তাহিয়াহ-অভিবাদন ক্রমধারায় সত্ত্বাবানদের জন্য নিবেদিত।

অনন্তর জ্ঞাতব্য যে, ইমামুল আউলিয়া ওয়াস্তুরীকৃত শাহানুশাহে মাইজভাগার হযরত কিবলা-ই 'আলম শাহে দু'আলম গাউসুল আ'যম সৈয়াদ আহমদুল্লাহ মাইজভাগারী রাঈয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইহ-জাগতিক ভাবে পদা করার শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলে, তদীয় মহান শান সংকোচনাত্রক বাড়াবাড়িমূলক কিছু মন্তব্য-বক্তব্য প্রকাশ পেতে দেখা গেল। এহেন ক্রান্তিকালে শানে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাগারী (রাঈ.) সম্পৃক্ত যথায় তথ্য ও তত্ত্ব নূতন আঙ্গিকে তুলে ধরার দাবী অনিবার্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মাইজভাগারী তুরীক্বা-দর্শনের অনুসারী মাত্রই নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে যথার্থরূপ তৎপর হওয়ার আবশ্যিকতা উপলব্ধি করতে পারা স্বাভাবিক। অন্যথায় নিরব দর্শকের ভূমিকাপালনকারীতে পরিগণিত হয়ে ঐতিহাসিকভাবে পরিত্যক্ত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাইতো মাইজভাগারী তুরীক্বা-দর্শনের সচেতন অনুসারীদের একটি বৃহত্তর ঐক্য ইতোমধ্যে গড়ে উঠতে দেখা গেল। কিন্তু স্ব স্ব দরবার ভিত্তিক পূর্বাধারবাহিকতায় প্রচলিত কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যস্ততার কারণে ঐক্যসম্পৃক্ত কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছেনা। তাই অনুভূত হয় যে, ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের পাশাপাশি আপন দরবার ভিত্তিক কার্যক্রম অংশেও সময়কালীন দাবী-প্রেক্ষিত কার্যক্রম জোরদার করা অত্যাৱশ্যক। এ মর্মে হারুয়ালছাডি দরবার শরীফে এবার মুর্শিদে মুকাররাম হাদীয়ে যমান গাউসুল ওয়াজ্জ হযরতুল আল্লামা কায়ী সৈয়াদ হারুনুর রশীদ (রাঈ.)'র বার্ষিক উরুসে পাক ২০১৪ উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচীর অন্যতম অংশ 'শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাগারী রাঈয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রবন্ধ সম্ভার-১' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা। 'আঞ্জুমানে তৌহীদ বতোফায়লে রশীদ'র প্রকাশনায় 'উরুসে হাদীয়ে যমান আল্লামা সৈয়াদ হারুনুর রশীদ

(রাঈ.) স্মারক গ্রন্থমালা-২' এটি।

এতে প্রচেষ্টা সাধ্যানুপাতিকই এবং পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো মনিব-মওজার মেহেরবানীপূর্ণ মর্জি নির্ভর।

যে সব বিশিষ্ট বিদ্বানগণের লিখনীতে এ প্রকাশনা সমৃদ্ধ, সেই সাথে যাঁরা লিখা সংগ্রহ, প্রকাশনার সামগ্রিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় কিংবা যে কোনভাবে সম্পৃক্ত হন, সকলেরই উদ্দেশ্যে জানাই অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতাসহ আন্তরিক শুভকামনা ও অভিনন্দন।

অপ্রত্যাশিত কোনরূপ ভুল-ত্রুটি পরিজ্ঞাত হতে পারলে সংশোধনী আনয়নসহ কৃতজ্ঞ হব।

পরিশেষে প্রার্থনা যে মহান আল্লাহ রবুল ইজ্জতের সম্ভ্রান্তি লক্ষেই গ্রহণীয় হোক আমাদের প্রতিটি প্রচেষ্টা, এমনকি মিত্রতা-বৈরিতাও; ক্ষমা-লব্ধ হোক অপ্রত্যাশিত যাবতীয় অশুচি এবং মনিবের খিদমাত হিসেবে গণ্য হোক প্রতিটি প্রয়াস। আমীন, ইয়া আব্রাহামাররাহিমীন! বিওসীলাতি রাহ্মাতিল্লিল আলামীন ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আহবাবিহী আজ্জাম্‌দীন।

সাধারণ সম্পাদক

আঞ্জুমানে তৌহীদ বতোফায়লে রশীদ

হারুয়ালছাডি দরবার শরীফ

হারুয়ালছাডি, ভূজপুর, ফটিকছাডি, চট্টগ্রাম।

হযরত গাউসুল আ'যম মাওলানা শাহ সৈয়দ আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (রা.)

হযরতুলহাজ্ব আল্লামা কায়ী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী

সৈয়দুল আউলীয়া, সনদুল আসফিয়া, জুবদাতুল আতকিয়া, মসনাদুল ওলামা, মারজাউল কুমালা, ইমামুসুন্নিকত, রাজদারে হাকীকত, গাউয়াছে বাহরে মারেকত, মাসদারে কাশফ ও কারামাত, মাখজানে ফুযুজাত ও কামালাত, বাংলায় গৌরব, অলীকুল শিরোমণি, আলোম সমাজের উজ্জ্বল রবি, মারেকাতের খনি, গাউসুল আ'যম জিলানী (রা.) ও খাজায়ে আজমিরী (রা.) এর ফয়জের কেন্দ্র, নবী খেমিক ও অলী ভক্তদের মিলন কেন্দ্র, আলোমে হকুনী, আরেকের রকানী, গাউছে নামদার, ওয়ালীয়ে ভাণ্ডার, গাউসুল আ'যমে মাইজভাণ্ডার হযরত মাওলানা শাহ আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী আলহাইর রহমতে ওয়ার রিহওয়ান। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ মতিউল্লাহ (রহ.), মাতার নাম সৈয়দা খাইরুননেছা (রহ.)। পিতা মাতা উভয়ে আগলোদে রাসূল, সৈয়দ বংশের ছিলেন। তাঁর বংশের পূর্ব পুরুষ সুদূর মদীনা মুনাওয়ারা হতে বাগাদাদ, দিল্লী, পরে তৎকালীন বাংলার রাজধানী গৌড় হয়ে একজন মহাপুরুষ সৈয়দ হামিদুদ্দীন গৌড়ী নামক কাজীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে ইসলামাবাদ চট্টগ্রামে গুড পদাপর্ণ করেন এবং পটিয়া ধানায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে হামিদগাঁও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। তাঁরই বংশের একজন সৈয়দ আব্দুল কাদের ফটিকছড়ি খানার অন্তর্গত আজিম নগর গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র সৈয়দ আতাউল্লাহ তৎপুত্র সৈয়দ তৈয়ব উল্লাহ। তাঁর তিন পুত্র জলগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় সন্তানের নাম মৌলভী সৈয়দ মতিউল্লাহ। তিনি মাইজভাণ্ডার গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি নিত্য দ্বীনদার ও পরহেজগার আলোম ছিলেন। তাঁরই পবিত্র ঔরসে গাউসুল আ'যম হযরত মাওলানা শাহ আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।

১২৪৩ বা ১২৪৪ হিজরী মোতাবেক ১২৩৩ বাংলা, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে, ১ মাঘ রোজ বুধবার তিনি ইহজগতে গুড পদাপর্ণ করেন।

সুন্নাত মোতাবেক চার বৎসর চার মাস বয়সে তখতী হাতে দেওয়া হয়। নিজ পরিবার ও স্বগ্রামে প্রাথমিক আরবী, ফার্সি, উর্দু ও বাংলায় শিক্ষা লাভ করার পর উচ্চ শিক্ষা লাভ করার মানসে প্রথমে হুগলী মোহাছেনিয়া মাদরাসায় পরে কলিকাতা আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ক্বোরআন, হাদীস, তাকবীর ও ফিকাহ ফতোয়ায় গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ছাত্র জীবনে সবসময় পরীক্ষায়

কৃতিত্বের সাথে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১২৬৩ হিজরী সনে যশোর জিলার বিচার বিভাগে তৎকালীন কাজী পদে নিয়োজিত হয়ে এক বৎসর কাল বিশেষ দক্ষতার সাথে উক্ত কার্য পরিচালনা করে নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের কাছে সুনাম অর্জনে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে পড়েন। সে সময় কলিকাতায় মুন্সি বু আলী মাদরাসায় প্রধান মুদাররিসের পদ শূণ্য হলে, তিনি শিক্ষা কার্যে ইচ্ছা প্রকাশ করায় কর্তৃপক্ষ অতি সাদরে তাঁকে আহ্বান জানান। অতঃপর ১২৭০ হিজরীতে যশোর জিলার কাজীপদ হতে তিনি শ্রেষ্ঠায় ইস্তফা দিলেন। কলিকাতা আগমন করে উক্ত মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এক বৎসর দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ইতিমধ্যে কলিকাতা আলীয়া মাদরাসায় একটি সিনিয়র পদ শূণ্য হয়। কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছে উক্ত পদে যোগদানের জন্য অগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনিও সম্মত হয়ে ১২৭২ হিজরী সনে উক্ত পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সূচকরূপে অধ্যাপনার গুরু দায়িত্ব পালন করে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জন করেন। কলিকাতাবাসী তাঁকে অত্যধিক শ্রদ্ধার সাথে দেখতেন। মাঝে মাঝে তাঁর নসীহত শুন্য মাহফিলের আয়োজন করতেন। কিন্তু বিচারালয়ে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা, ধর্মীয় শিক্ষাদানে শিক্ষা দান করা, ওয়াজ মাহফিলে হিদায়তের আলো বিস্তার করা এসব সীমিত আর্থিক খিদমতের জন্য তাঁর সৃষ্টি নয়। বরং সমগ্র জগতে শরীয়ত, তরীক্বত, হাক্কীকত ও মারিফতের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে আল্লাহ জাব্বা শানুহ এবং তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঠিক সন্ধান ও পরিচয় দিয়ে আল্লাহর বান্দাদেরকে রাহমাতুল্লিল আলমীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রহমতের বৃকে আল্লাহ পাক সুবহানাহ ওয়া তা'আলার কুদরতের হাতে পৌঁছানোর মহান গুরু দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। সুতরাং একদিকে শরীয়তের অপর দিকে তরীক্বতের পথ সুগম করে নিতে সর্বদা সর্বক্ষণ নিজেই আত্মনিয়োগ করতেন।

দিনের বেলায় মাদরাসায় মনোনিবেশ ও তালীমের খিদমত, রাত্রিকালে বিভিন্ন ওলী বুয়ুর্গের মাজারে গিয়ে ইবাদত, রিয়াজত, সাধনায় প্রবৃত্ত থাকতেন। এ দিকে গাউসুল আ'যম জিলানী (রা.) এর একজন বংশধর রুহানী প্রবল তাপারবোরফ ও শক্তির অধিকারী, কুদওয়াতুল আরেফীন, সনদুল কামিলীন, জুবদাতুসুনালেকীন হযরত মাওলানা শাহ আবু শাহমা মুহাম্মদ খালেহ লাহরী (রা.) সারা দেশে য়ার অসংখ্য মুরীদ ও ভক্ত, সমগ্র দেশের বড় বড় বিখ্যাত ওলামায়ে কিরাম তাঁর মুরীদ। য়ার সাক্ষাৎ ও দো'আর জন্য জনসাধারণ অপেক্ষায় থাকতেন। য়ার অন্তর দৃষ্টি চুম্বকের মত ক্রিয়া করে, য়ার সংস্পর্শে মুহূর্তের মধ্যে স্বর্ণে পরিণত হয়। তাঁর খানেকাহ ছিল লাহর, দিল্লী ও কলিকাতায়।

একদা জোহরের নামায়ের পর তিনি মুরীদ ও ভক্তদের নিয়ে খানেকায় উপবিষ্ট ছিলেন। ওই সময় হযরত কেবলা সওয়াবীতে আরোহণ করে ভক্তদের কাফেলা সহ এক ওয়াজ মাহফিলে যাচ্ছিলেন। ঠিক সে শুভ লগ্নে রব্বুল ইজ্জতের পক্ষ হতে তাঁর পবিত্র অস্ত্রের নির্দেশ হয়েছে, হে আবু শাহমা (রা.)! তোমার পূর্ণ জীবনে সাধনার মাধ্যমে অর্জিত ও আল্লাহর পক্ষ হতে মারিফাতের সাগর হতে তোমার কলবে যে মানিক আমানত রয়েছে তা এ সওয়ার যিনি তোমার হৃজ্বার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁকে থেকে সাপরে ওই মারিফাত সাগরের মানিক প্রদান কর। যদিও যুগবরণে বহু ওলামায়ে দ্বীন তোমার স্পর্শে এসে ধন্য হয়েছে কিন্তু ইনিই একমাত্র তোমার প্রধান খলিফা হওয়ার হকদার। এই ঐশ্বরিক বাণী বা ইলহাম দ্বারা তিনি তাঁর সাক্ষাত পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উপস্থিত সকলের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কে? আপনারা কেউ কি তাঁকে চিনেন? সকলেই সচকিত ও নিরব। একমাত্র তাঁর এক মুরীদ এনায়েত উল্লাহ সাহেব বললেন, হযর তিনি! তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা করলেন। এতে তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং শাহ্ এনায়েত উল্লাহকে শীঘ্রই গিয়ে তাঁকে থেকে আনতে নির্দেশ দিলেন। এনায়েত উল্লাহ গিয়ে দেখলেন যে, তিনি সওয়ার হয়ে ওয়াজ মাহফিলে ভক্তবৃন্দের কাফেলাসহ রওয়ানা করেছেন। এনায়েত উল্লাহ মূহূর্তের মধ্যে তাঁর সওয়ারির কাছে পৌঁছে তাঁকে হযরত লাহরী (রা.) এর সংবাদ জানালেন। এখন তিনি দ্বিধায় পড়লেন। একদিকে মাহফিলে বহুলোক অপেক্ষায় আছে, অপর দিকে একজন আল্লাহর ওলীর আস্থান। কিছুক্ষণ চক্ষু বন্ধ করে সিদ্ধান্ত নিলেন। না, না আল্লাহর ওলীর ডাক উপেক্ষা করা যায় না বা বিনয়ও করা চলে না। মাহফিলে যাওয়া স্থগিত করে এনায়েত উল্লাহ শাহ্ ও হযরতের দরবারের ভক্তবৃন্দের সঙ্গে হযরতের খানেকাহ শরীফে পৌঁছালেন। দেখা গেল, হযরত আকদস অপেক্ষায় আছেন। তাঁকে দেখা মাত্র সাপরে অভ্যর্থনার জন্য আপন আসন হতে উঠে দরজায় এসে স্বাগতম জানিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে নিজের পাশের আসনে বসালেন এবং হাত ধরে বায়আত করালেন।

এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত মুরীদ ও ভক্তবৃন্দ অবাক হয়ে গেলেন। কারণ পূর্বে কখনও কারো অভ্যর্থনার জন্য এভাবে আসন থেকে উঠেননি, কোলাকুলি করেননি, নিজের আসনে বসাননি এবং হাত ধরে বায়আত করাননি। কারণ সাধারণের নজর থাকে বর্তমান ও প্রকাশ্যের উপর। আর ওলীর দৃষ্টিতে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং প্রকাশ্য ও গোপন সব কিছু দেখেন। এখানে হযরত আকদস কলিকাতা আলীয়া মাদরাসার একজন শিক্ষককে সম্মান করেননি বরং ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টি রেখে একজন গাউসুল আ'যমকে সম্মান করেছেন। অতঃপর তিনি ওই দিন বিদায় গ্রহণ করলেন। তাঁর প্রস্থানের পর হযরত শাহ্

আবু শাহমা (রা.) বলতে লাগলেন, এবার খোদা আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। যাঁর প্রতিক্ষায় ছিলাম তাঁকেই আল্লাহ মিলিয়ে দিলেন। সারাটা জীবনে সবেমাত্র একটি লোকের হাতেই হাত মিলানাম। আল্লাহ তাঁকে গাউসিয়াত ও কুবুবিয়াতের মক্কাতে অধিষ্ঠিত করল। হযরত বিদায় গ্রহণান্তে বাসায় ফিরলেন বটে কিন্তু উভয়ের মধ্যে এমনি এক যোগসূত্র স্থাপিত হল যার কোন সীমা নেই। আছে সুদূর প্রসারী দাহন। তাঁরা একে অন্যের মিলন প্রয়াসী, দর্শন প্রত্যাশী। একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ না করে পারতেন না। এ অবস্থায় তিনি হযরত আকদসের বড় ভাই হযরত শাহ্ সৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ (রা.) এর খিদমতে গিয়ে ফরোজ গ্রহণে আদিষ্ট হলেন। পীর সাহেবের এ আদেশে তিনি অতি আহলাদিত চিত্তে তাঁর খিদমতে রাওয়ানা হলেন। এমনি সময় চিরকুমার শাহ্ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ (রা.) আপন হৃজ্বা শরীফ হতে বাইরে পদার্পণ করলেন। হযরত কেবলা তাঁকে অভিদান জানাতেই তাঁর শুভ দৃষ্টি হযরতের প্রতি আকর্ষিত হল। তিনি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তাঁর পবিত্র আত্মার উপর ফরোজ এগেহাদীর প্রভাব বিস্তার করলেন এবং তাঁর পক্ষ হতে খোদা প্রদত্ত শক্তি এবং বাতেনী নেয়ামত হযরত কেবলাকে সাপরে দান করলেন। এভাবে তিনি দু'জন মহান পবিত্র মণিধর আউলিয়ার দুর্লভ মণি আহরণ করে নিলেন। তখন হতে হযরতের জজবাতী অবস্থা অত্যধিক প্রবল হয়ে পড়ল। তাই তিনি দিব্যভাগে দ্বিনি শিক্ষা দানে ও সারারাত জেগে নিবুম ধ্যানে অক্লান্ত ইবাদত ও অকাতরে রিয়াজত সাধনায় কাল যাপন করতে লাগলেন। আধ্যাত্মিক প্রেরণার প্রাচুর্যে প্রায় সময় তিনি আত্মতোলা হয়ে পড়তেন। মোরাকাবা মোশাহাদায় তাঁর অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে যেত। ক্রমেই জজবাতী অবস্থা এত অধিক পরিমাণে বাড়তে চলল যে, প্রেরণাধিক্যে বিভোর হয়ে পানাহার ত্যাগ করতে লাগলেন। স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য নেই, জীবন যাপনের আশা ও ভয়ভীতি নেই। অবিন্দ্রা, অনাহারে প্রায় দিন কাটাতে লাগলেন। কোন কোন সময় যৎসামান্য নাড়া বা পানীয় পালে রোজা পালন করতে লাগলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে লাগল। এদিকে হযরতের আবসাজান মৌলভী মতিউল্লাহ (রহ.)ও ইতিকাল করেন। ঠিক এ সময়ে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির দুঃখজনক সংবাদ পেয়ে হযরতের জননী সন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়ে সকলের সাথে পরামর্শ করে হযরতের মধ্যম ভ্রাতা জনাব শাহ্ সৈয়দ আব্দুল হামিদকে কলিকাতায় পাঠালেন। তিনি তাঁকে হযরত পীর সাহেব কেবলার অনুমতিক্রমে সযত্নে বাড়ীতে আনলেন। আল্লাহ পাকের অসীম রহমত বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁর শরীর দিনদিন সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি পূর্ববৎ ধ্যানরত ইবাদত রেযাজতে নিমগ্ন রয়ে গেলেন। তাঁর স্নেহময়ী জননী পুত্রের এরূপ অবস্থা দর্শনে উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠলেন।

ভাবতে লাগলেন কিভাবে পুত্রের মন সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন। স্থির করলেন, বিবাহের সূত্রে আবদ্ধ করলে নিশ্চয় সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। বিবাহ ঠিক করা হল, ১২৭৬ হিজরীর বৈশাখ মাসে ৩২ বছর বয়সের সময় আজিমলগর নিবাসী মুন্সি সৈয়দ আফাজুদ্দিনের কন্যা মুহাম্মৎ সৈয়দা আলফুন্নেছা বিবির সাথে হযরতের বিবাহ বন্ধন স্থাপন করা হল। আল্লাহর মর্জি ছয় মাসের মধ্যে তাঁর এ বিবি জাগ্নাতবাসিনী হলেন। ঠিক সে বছরই হযরতের জননী তাঁকে পুনঃ উক্ত আজিমলগর নিবাসী সৈয়দা লুৎফুল্লিসা বিবির সাথে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তিনি উক্ত আজিমলগর নিবাসী সৈয়দা আফাজুন্নাহ সাহেবের স্নেহময়ী কন্যা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। প্রেম প্রীতি ভালবাসা নানাভাবে কায়মন বাক্যে হযরতের চিত্তবিনোদনে খিদমত করে সংসারের প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু হযরত পূর্বের মত নির্বিকারে আরো অধিকতর রোযাজত সাধনায় দিন কাটাতে লাগলেন।

এভাবে সুদীর্ঘ প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। ১২৭৮ হিজরীতে তাঁর এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হল সৈয়দা বদিউল্লাহা বিবি। ইনি চার বৎসর বয়সে জন্মাতবাসিনী হন। তাঁর আর একটি পুত্র সন্তান হয়েও অল্প দিনে ইহসংসার ত্যাগ করেন। ১২৮২ হিজরী ১৩ চৈত্র তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় সৈয়দ ফয়জুল হকু। আরো ৮ বৎসর পর তাঁর এক কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাঁর নাম রাখা হয় সৈয়দা আনোয়ারুল্লাহা। হযরতের একমাত্র পুত্র সন্তান জন্মাব মৌলভী ফয়জুল হকু সাহেব ২ জন পুত্র সন্তান রেখে অল্প বয়সে হযরতের পূর্বেই জাগ্নাতবাসী হন। এমনিভাবে হযরত কেবলা (রা.) অনাহারে অনিদ্রায় যাবতীয় সুখ শান্তি ও স্বার্থকে বিনর্জন দিয়ে অবিরাম অবিশ্রাম কঠোর নিখুম সাধনার বিনিময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শক্তি, সর্বোত্তম বেলায়ত পদবী বেলায়তে ওজমার অধিপতি হন।

বেলায়তের প্রথম বিকাশ ও ফুটুহাত তথা বিজয়ের আরম্ভ:

ধীরে ধীরে সাংসারিক অভাব আরো বাড়তে চলল। তাঁর আম্মাজান ভবিষ্যত চিন্তায় অধীর হয়ে পড়লেন। হযরত যে পূর্ণ কুঠিরে বাস করতেন, উহা ছনের ছাউনিযুক্ত ছিল। অনেক দিন হয় উহার ছাউনি বদলানো হচ্ছিল। এখন ছাউনি বদলানোর নিত্য প্রয়োজন। হযরতের মাতার প্রচেষ্টায় কোন মতে বাঁশ ছনের ব্যবস্থা হল। ঘর ছাউনি দিতে লোক নিযুক্ত হল। নির্দিষ্ট দিনে চারজন লোক উপস্থিত। তারা দিন মুজুরী কামনায় কাজ করে। হযরতের আম্মাজান তাঁকে বললেন, বাবা আহারের সময় হচ্ছে, মেহমান কর্মীদের তো খাবার দিতে হবে। আহারের সময় হচ্ছে, জোগাড় তো কিছুই নেই। হযরত যেন অন্যমনস্ক হয়ে

রইলেন। তাঁর মাতা পুনঃ পুনঃ খাদ্য জোগাড় সম্বন্ধে হযরতকে তাকিন দিতে রইলেন। হযরত মুদু হেসে বললেন, 'আচ্ছা আম্মা'। আবার পূর্ববৎ ধ্যানে রত হলেন। তাঁর উত্তরে মনে হল যেন এখনও অনেক সময় আছে। বাস্তব অন্যান্য লোকেরা কানাকানি করতে লাগল। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মজুরদেরকে উপবাসে ফিরিয়ে দিলে লোকের কাছে বড় নিদনীয় হবে। এমনিভাবে ঘরে বসে আশ্রয় আল্লাহ করলে আল্লাহু খাদ্য খাবার কি ঘরে এনে দেবেন। কাজ কর্ম করতে আল্লাহ কি নিষেধ করেছেন? এ দিকে ঘরের মজদুররা গোপল করে খাবার খেতে আসলেন। হযরত তাঁর আম্মাজানকে বললেন, আম্মাজান মেহমানদেরকে খানা খাওয়ার জন্য বিছানা দিতে হবে। তিনি চিন্তিতভাবে নিম্নস্বরে বললেন, বিছানা দিয়ে কি হবে, অদ্য ঘরে রান্নার কোন জোগাড়ই হয়নি। হযরত পুনঃ বললেন, মেহমানদের জন্য খানার বিছানা দেওয়া হউক আমিও আসছি। এক সঙ্গে খানা খাব। অগত্যা বিছানা দেওয়া হল। মেহমানগণ ঘরে আসলেন। হযরত এখনও আসেননি। তাঁর আম্মাজানও বিবি সাহেবা লজ্জায় ও চিন্তায় উদ্ভিন্ন। বাড়িহ লোকেরা হযরতের উপর একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা বলাবলি করতে লাগল যে, বিছানা না দিয়ে মেহমান উপবাস ফিরিয়ে দিলে কোন মতে চলতো। এখন একেবারে ইজ্জত যায়। আমরাও বা হঠাৎ কি করতে পারি। সকলে লজ্জায় অস্থির। এমন সময় দেখা গেল একজন লোক ও দুজন মুটিয়ে পিছনে বাস্তির দিকে আসছে। মুটিয়াদের কাছে দু'ভার আহারীয় সামগ্রী। তাঁরা সামনের পুকুর ঘাটে বসল এবং জানতে চাইল যে, ফকীর মাওলানা সাহেবের ঘর কোনটি? তখন হযরত বাইরে আসলেন, তাঁরা হযরতকে দেখে অতি আনন্দে অভিব্যক্ত সালাম কদমবুটি করল এবং আনিত আহার্য হাদিয়া তাঁর সামনে পেশ করে আরজ করল, হযুর! স্বপ্নাদিষ্ট হয়েই এ সামান্য হাদিয়াটুকু আপনার জন্য এনেছি। হযরত সাদরে উহা গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে অয়ু করে ঘরে আসতে নির্দেশ দিলেন। টুকরিতে বকরির কোরমা ও সর্ক চাউনের পোলাউ, খানাগুলো যেন এই মাত্র পাকায় আনা হয়েছে। তাঁরা অয়ু করে ঘরে আসলেন। হযরত মেহমানগণকে সঙ্গে নিয়ে সানন্দে আহার করলেন। সামান্য কিছু অংশ ঘরে রেখে বাকীটুকু বাড়ীর লোকজনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত কেবলার আধ্যাত্মিক প্রভাবে চট্টগ্রাম মোহছিনিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত ও মোদাররিস্ নিযুক্ত: ওই যুগে বর্তমানে যে পাহাড়ের উপর মুহসিন কলেজ রয়েছে তথায় চট্টগ্রাম কোর্ট কাছারী ছিল। একদা হযরত মাওলানা শাহ্ মাহিছুল্লাহ্ মির্জাপুরী (রহ.) সুবহে সাপিকের পূর্বে তাহাজ্জুদের নামায় পাত্র উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামস্থ কাতালগঞ্জ মাওলানা বশির উল্লাহ সাহেবের মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, কেবলমাত্র একজন লোক আপাদমস্তক চাঁদর আচ্ছাদনে

মোরাকাবা অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁকে তাঁর পীর ভাই মুছা মিয়া মনে করে উপহাস স্বরূপ বললেন, দিনের বেলায় সংসার কাজে মগ্ন থেকে রাত্রি কালে এভাবে ফকিরী দেখানো কি শোভা পায়? মুখ ঢেকে ফকিরী করলে ফকিরী কি বেশী হাসিল হয়? এভাবে তিন বার বলার পরও কোন উত্তর না পেয়ে আদার সহকারে স্বজ্ঞারে মুখ হতে কাপড় সরিয়ে দেখতে পেলেন, তিনি তাঁর কল্পিত মুছা মিয়া নন বরং মাইজভাণ্ডারের হযরত কেবলা (রা.)। তিনি মোরাকাবায় বিভোর এবং নয়ন মুগল লোহিত বর্ণ। হযরতের সাথে বে আদারী হয়েছে মনে করে তিনি ভয়ে ও লজ্জায় জর্জরিত হয়ে পড়লেন। তাঁর হৃদয়কম্পন শুরু হল। হযরত কেবলা তাঁর ভুল ও কাতরতা বুঝতে পেরে মৃদু হেসে বললেন, সৈয়দ সাহেব নাকি, ভাই সাহেব! আমি নাছারাগণকে কালেকটরী পাহাড় হতে নামিয়ে দিলাম। তথায় এক কুরসী আপনাকে, এক কুরসী মওলভী খোদা নেওয়াজ সাহেবকে, এক কুরসী মওলভী জুলফিকার আলী সাহেবকে এবং আর এক কুরসী সূফী আব্দুল অদুদ সাহেবকে প্রদান করলাম। হযরত মাওলানা মহিউল্লাহ সাহেব হযরতের এ ভবিষ্যৎবাণী এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতার আভ্যন্তরীন প্রভাবের তাৎপর্য মর্ম রহস্য উপলব্ধি করতে পারলেন না। প্রায় আট বৎসর পর কোট কাছারী উক্ত পাহাড় হতে স্থানান্তরিত হয়ে বর্তমান কাছাত্তী পাহাড়ে চলে যায় এবং তথায় মোহেউদ্দিনিয়া মাদরাসার পত্তন হয়। হযরতের ভবিষ্যৎ বাণীতে বর্ণিত মতে, উক্ত মওলভী সাহেবগণও ওই মাদরাসায় প্রথম মোদাররিস নিযুক্ত হন। তখন তিনি হযরতের ভবিষ্যৎ বাণীর প্রত্যক্ষ ফল দেখে তাঁর কালাম ও প্রভাব রহস্য বুঝতে পারলেন। এভাবে হযরতের ইঙ্গিতে ও প্রভাবে চট্টগ্রামে সর্ব প্রথম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরতের প্রভাবে নাজিরহাট জামেয়া মিল্লিয়া আহমদিয়া মাদরাসা ও মসজিদের স্থান নির্ণয় ও পত্তন: তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত নাজিরহাট জামেয়া মিল্লিয়া আহমদিয়া মাদরাসা ও তৎসংশ্লিষ্ট মসজিদ তাঁরই পূর্ব ভবিষ্যৎবাণী ও প্রভাবের ফল। উক্ত স্থানে একটি বটবৃক্ষ ছিল। হযরত কেবলা সফর কালে প্রায় সময় তথায় গাছ তলায় বসতেন। একদা তিনি বড় বটগাছের গায়ে পবিত্র কুরআনের পাতা লটকিয়ে দিয়েছিলেন এবং কালামের মাধ্যমে উক্ত মাদরাসা ও মসজিদের স্থান নির্দিষ্ট করে বলেছিলেন, “এখানে আমার ছয়টি কিতাব আছে। তোমারা পড়িও।” ফলে বহুদিন পর উক্ত নির্দেশিত স্থানে হযরতের নামে এ মাদরাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরতের অন্তর্দৃষ্টি ও কণ্ঠ ক্ষমতার পরিচয়: চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নানুপুর নিবাসী মোহাম্মদ মাহমুদ আলী সাহেব হযরতের সমসাময়িক অতি

প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি হযরতের বেলায়ত সম্বন্ধে ওয়াকফ হাল ছিলেন না। বরং আমলিয়াত বলে ধারণা করতেন। এক সময়ে তিনি হালুয়া তৈয়ার করার জন্য মেওয়া (ফল) সংগ্রহ করতেছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, ওই যুগে এদেশে মেওয়া (ফল) খুব দুর্প্রাপ্য ছিল। সুতরাং তিনি আপন ছেলেকে তাঁর পরিচিত বাল্যবন্ধু হযরত কেবলা (রা.) এর কাছে একটি টাকা ও সঙ্গে একটি রুমাল দিয়ে এই ধারণা করে পাঠালেন যে, তাঁর কাছে ভক্তবৃন্দ বহু মেওয়া (ফল) এনে থাকেন। হযরত প্রয়োজনীয় কিছু ফল তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। তাঁর ছেলে মওলভী মোহাম্মদকে বলে দিলেন, তুমি গিয়ে হযরতের শাহজাদা সৈয়দ ফয়জুল হককে এই টাকা দিয়ে বলবে, আমার কিছু ফলের দরকার, কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। যতটুকু পাওয়া যায়, দিতে বলিও। কারণ কোথাও পাচ্ছিলাম। হযরত সব পাওয়া যাবে না। কিন্তু ছেলেকে কি কি ফল, কত পরিমাণ কিছু বলেনি। মওলভী মোহাম্মদ গিয়ে শাহজাদার হাতে টাকা দিয়ে ফল চাইলেন, তিনি ফল দিতে রাজী হলেন। টাকা গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। হযরত কেবলা (রা.) হুজরা শরীফ হতে উভয়ের আলাপ শুনে শাহজাদাকে ডেকে বললেন, ফলের টুকরী সমূহ এখানে নিয়ে আস। হযরত কেবলা টুকরী হতে বিভিন্ন রকমের ফল রুমালে গাটি বেঁধে মওলভী মোহাম্মদের হাতে দিয়ে বললেন, যান বাবা! এই গাটি আপনার বাবাকে দিয়ে বলবেন যে, তাঁর নোসখা অনুযায়ী সব ফল দেওয়া হয়েছে। পথে খুলবেন না। মওলভী মোহাম্মদ সাহেব পথে ভাবতে রইলেন যে, হযরতকে নোসখার কথাও বলা হয়নি বা কি ফল তাও বলা হয়নি, পরিমাণও বলা হয়নি। কি করে জানলেন। এসব কথা সারা রাত্তর ভাবতে রইলেন। ঘরে পৌঁছে গাটি পিতার হাতে দিলেন। খোলা পর পিতা এবং ছেলে অবাক হয়ে গেলেন যে, নোসখায় যে সব ফলের প্রয়োজন ছিল সব আছে। তিনি সেগুলো নিয়ে ওজন করে দেখলেন, ওজনও নোসখার অনুসারে হয়েছে। এখন মোহাম্মদ মাহমুদ আলী সাহেব বলতে লাগলেন, আমার ভুল আজ ভাঙ্গল। তিনি সাধারণ লোক নন। নিশ্চয় তিনি অন্তর্দৃষ্টিধারী কণ্ঠ কারামতের অধিকারী একজন প্রকৃত ওলীউল্লাহ।

হযরত কেবলার আধ্যাত্মিক প্রভাবে একজন হাজী সাহেবকে এক রাত্রে মক্কা শরীফ হতে চট্টগ্রাম শহরে প্রত্যাপন: চট্টগ্রাম নানুপুর নিবাসী ডাঃ সৈয়দ খাইরুদ্দিনের এক বন্ধু হজ্ব করতে গিয়ে হজ্ব সম্পাদনের পর সঙ্গী কক্ষেলা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মালামালও হারিয়ে ফেলে। থাকার খাওয়ার, দেশে ফিরে আসার ব্যবস্থা করার কোন পথ পাচ্ছেনা। এই নিক্রপায় অসহায় অবস্থায় পাগলের ন্যায় বসে বসে কান্নাকাটি করছেন। কারণ নিজ দুঃখের কথা অন্যকে বুঝানোর জন্য ভাষা-জ্ঞানও নেই, কেউ তার কথা বুঝে না সেও কারো কথা

রুখে না। এই হাজী সাহেব অসহায় নিকপায় মহাবিপদের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে আল্লাহর ঘরে গিয়ে কান্নাকাটি করে দো'আ করলেন। ওহে ঐতু! আমাকে তোমার শ্রিয় বান্দা, যাকে বান্দাদেরকে বিপদমুক্ত করার ক্ষমতা দিয়েছ, মিলিয়ে দাও। যদি মদীনা পাকের রওজা মোবারকে জিয়ারত করতে গিয়ে মক্কায় মুয়াজ্জামায় পবিত্র কাবা শরীফের তাওয়াফ করতে গিয়ে কোন ভুল আশ্চি হয়, মুনীব! ক্ষমা করে আমাকে দেশে ফেরার ওচ্ছিনা করে দাও। পরদিন সন্ধ্যায় মাইজভাণ্ডারের ফকীর মাওলানা হযরত মাওলানা আহমদুল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যবিশিত ও অল্পদিত হ'লেন। ভক্তিপূর্ণ সালাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হযুর আপনি কখন মক্কা শরীফ এসেছেন? উত্তর দিলেন তিনি হজ্জের পূর্বে এসেছেন। আমি আমার সমস্ত দুঃখস্বপ্নের কথা তাঁর নিকট ব্যক্ত করলাম। তখন তিনি আমাকে সাত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার আর কোন চিন্তা নেই, আমার সাথে আসুন। আল্লাহ্ আপনার বাত্মিতে পৌঁছিয়ে দেবেন। এ কথা বলে তিনি পথ চলতে লাগলেন। আমিও আনন্দিত মনে তাঁর পিছনে চলতে লাগলাম। পথে আমাকে নিয়ে এক নির্জনস্থানে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। নামাযের পর একটি ধনে হতে কিছু মেওয়া (ফল) ও পানীয় আমাকে দিলেন। আমি খেয়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। তারপর ধনে হতে একটি মোমাবতী বের করে জ্বালালেন এবং বাতিটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, আপনার সমুখ দিকে দৃষ্টি করুন, আমি সমুখ পালে তাকিয়ে দেখলাম অদূরে একটি অতুজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলছে। উহার আলোক রশ্মি যেন আমার দিকে পালিয়ে আসছে। আমি একটি উজ্জ্বল প্রদীপ দেখছি বলে জানলাম। তিনি একটি “ইছিম” শিথিয়ে দিয়ে বললেন, ভাই সাহেব আপনি পড়তে পড়তে এক ধ্যানে দ্রুত ওই প্রদীপটির দিকে অগ্রসর হউন। এদিক ওদিক তাকাবেন না। কথামত কাজ করলে আল্লাহ্ অতি সত্ত্বর আপনাকে দেশে পৌঁছাবেন। দেশে পৌঁছে এ সমস্ত কথা কাউকে প্রকাশ করবেন না। আমি তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে “ইছিম”টি জপতে জপতে প্রদীপটির দিকে একপ্রতিতে মুগ্ধ হয়ে চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ চলে হঠাৎ আমি “ইছিম”টি ভুলে গেলাম এবং সামনের উজ্জ্বল প্রদীপটিও অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বিপদ মনে করে অতিশয় ভীত হয়ে পড়লাম। এ দিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেলাম আমি চট্টগ্রাম শহরের সদর ঘাটে এসে পৌঁছেছি। তখন সময় সূর্যহাসে সাদিক। চারিদিকে লোকজন চলাফেরা করছে। আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম। এমাত্র যেন পথ চলা আরম্ভ করলাম। কি অদ্ভুত কাণ্ড একি কারামত! হযরত কেবলা (রা.) এর এই অপূর্ব অলৌকিক শক্তি অসীম অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ দর্শনে আমি আনন্দে ব্যাকুল হয়ে খোদার শোকর এবং অকাতরে তাঁর কৃতজ্ঞতা

শরীকার করতে লাগলাম এবং স্বচক্ষে তাঁর অবস্থা অবলোকন করার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। আমার বিশ্বাস যে, হযরত কেবলা হজ্জে যাননি। গেলে অবশ্যই শুনতাম। তিনি আমাকে উদ্ধার করার জন্যই এই অলৌকিক কীলা প্রদর্শন করেছেন। তিনি নিচয় বাত্মিতে আছেন। এই সমস্ত কল্পনা করতে করতে আমি বাড়ীর দিকে নয়, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের পালে রওয়ানা হলাম। বেলা দুটোর সময় আমি দরবার শরীফ পৌঁছে খবর নিয়ে জানলাম, তিনি ইতিমধ্যে কোথাও যাননি। এখন বিন্দু মাত্রও সন্দেহ রইল না যে, তিনি আমাকে আনার জন্য অলৌকিক শক্তিবলে গিয়েছিলেন। আমি আত্মহারা হয়ে তাঁর পবিত্র চরণে গুটিয়ে পড়ে আনন্দাশ্রুতে তাঁর পদমুগল ভাসিয়ে দিলাম। হযরত কেবলা (রা.) আমার মাথায় তাঁর করুণা মাখা হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন। হাজী সাহেব! আপনার ওয়াদা ঠিক রাখবেন। কোন কষ্ট হয়নি তো? আমি আরজ করলাম, হযুর আমাকে যা শিখিয়ে ছিলেন, তা ভুলে গিয়েছি। দয়া করে আবার শিখিয়ে দিন। হযরত উত্তর দিলেন, আপনার কাজ তো সেরে গেছে। এখন আর দরকার নেই। এ বলে খাদেমগণকে বললেন, এ লোকটি বহু দূর হতে এসেছে, তিনি পথভ্রমণে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিত্য কাতর হয়ে পড়েছেন। পানাহারে পরিতৃপ্ত কর। খাদেম সাহেব আদেশ পেয়ে আমাকে তৃষ্ণার সাথে ঝাওয়াতে বসতে দিলেন এবং নানাভাবে প্রণী করতে লাগলেন। আমি প্রকৃত ঘটনা গোপন করে অতি সতর্কতার সাথে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলাম এবং মক্কা শরীফ হতে অন্যই কোন দয়ালু পরোপকারী বাদশাহ্ তুল্য ব্যক্তির অনুগ্রহে এসেছি বলে জানলাম।

হযরতের বেলায়তী ক্ষমতায় বাহুতে হাত রেখে জনৈক হাজীর অলৌকিকভাবে বাত্মিতে প্রত্যাবর্তন: নেয়াখালী জিলার অন্তর্গত সুধারাম ধানার জগদানন্দ গ্রাম নিবাসী মওলানা মোহাম্মদ ইদ্রিস ভূঁইয়া সাহেব বলেন, তিনি সীতাকুন্ড মাদরাসায় পাঠ্যাবস্থায় হাজী আব্দুল আজীজ সাহেবের বাত্মিতে জায়গীর থাকতেন। সে গ্রামের লোকজন প্রায় মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে আসা যাওয়া করতেন। তিনি একদিন তাদেরকে বললেন, আপনারা যে মাইজভাণ্ডারে যান, ওই দরবারের বুয়ুগীর কি প্রমাণ আছে? তখন হাজী সাহেবের ছেলে নিয়ু লিখিত ঘটনা শুনালেন। আমার বাবা যিনি দুই তিন বৎসর আগে ইন্তিকাল করেছেন। তিনি হজ্জে গিয়ে হজ্জ সম্পন্ন করার পর সঙ্গী কাফেলা হতে বিচ্ছেদ হয়ে পড়ে নিজের মালামাল ও হারিয়ে ফেলেন। অসহায় নিকপায় হয়ে আল্লাহর ঘর খানায় কাবায় বসে বসে কান্নাকাটি করতে থাকে। হায়! আমি এখানে থাকার, ঝাওয়ার বা দেশে ফিরে যাওয়ার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। এক রাত্রে একজন অপরিচিত লোক এসে আমার কাছে কান্নাকাটির কারণ জানতে চাইলে তাঁকে দুঃখের কথা বিস্তারিত জানলাম। ওই মোহেরবান বললেন, আমার তো কিছু

করার নেই; তবে অবশ্যই আগামীকাল মাগিরিদের সময় আমার সাথে সাক্ষাৎ করলে আমি একজন অল্পাধর কামিল গুলীর সন্ধান আপনাকে দেব। যদি তাঁর সুদৃষ্টি নসীব হয় আপনার কোন সমস্যা থাকবে না। কথা মত আমার বাবা হাজী সাহেব পরদিন মাগিরিদের সময় ওই লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি দূর হতে ইশারায় হযরত কেবলা (রা.) এর দিকে দেখিয়ে দিলেন এবং আপন দুঃখ দুর্দশার কথা বিনয় সহকারে তাঁকে জানাতে বললেন। এর পূর্বে বাবা হযরত কেবলাকে চিনতেন না। আকা সালাম কদমবুসী আরজ করে তাঁর চরণ যুগলে লুটিয়ে পড়ে কান্নাকাটি করতে থাকেন; তখন হযরত কেবলা (রা.) দয়াপরবশ হয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। বাবা তাঁর বিপদের কথা জানালেন। হযরত কেবলা সাখুনা দিয়ে বললেন, চিন্তার কিছু নেই, আস আমি তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেব; আল্লাহ সহায় আছেন। অতঃপর তাঁর মস্তক, মুখমণ্ডল সহ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। তখন হযরত কেবলা (রা.) তাঁর ডান বাহু ধরে তাঁকে হাঁটিতে বললেন। হযরতের নির্দেশ মতে কিছুক্ষণ চলার পর তাঁর ডান বাহু হালকা অনুভব হল। মনে হল যেন হযরতের হাত মোবারক তাঁর বাহুর উপর নেই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীর অবশ মনে হল। তিনি আর চলতে পারছেন না। ঠাণ্ডার পারিবর্তে গরম অনুভূত হতে লাগল। এখন তিনি দাঁড়িয়ে মুখ হতে কাপড় সরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, হযরত কেবলা আছেন কিনা; দেখলেন হযরত নেই এবং তিনি নিজেকে আপন বাড়ীর রাস্তার মাথায় দণ্ডায়মান পেলেন। তিনি বিস্ময়ে অবাক হয়ে অনেকগুলি দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে তাঁর হুঁশ হলে বাড়িতে গেলেন।

হযরতের অল্পত আধ্যাত্মিক প্রভাবে বাঘের মুখে বদনা (লোটা) নিক্ষেপ করে ভক্ত উদ্ধার: একদিন হযরত কেবলা (রা.) নিজ হুজুরার সামনে পুকের পাড়ে বসে অয় করছিলেন। হঠাৎ জজবাব অবস্থায় এসে সজোরে বলে উঠলেন, “হারামজাদা তুই এখান হইতে দূর হস নাই” এবং হাতের বদনা (লোটা) পুকের দিকে নিক্ষেপ করলেন। এই সময় অয় শেষ হয়নি। সুতরাং খাদেমগণ অন্য লোটা এনে দিলে অয় শেষ করলেন। তারপর পুকের লেমে বদনা (লোটা) বেশ খোঁজ করা সত্ত্বেও পাওয়া গেল না। সকলে অবাক হয়ে রইলেন। এই রহস্য কেউ বুঝতে পারলেন না। দু’দিন পর রাঙ্গুনীয়া কোদালা এমের ইছমত আলী নামক হযরতের একজন ভক্ত মুরীদ কিছু নাস্তা এবং পুকের নিক্ষেপ করা লোটা নিয়ে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে সালাম, কদমবুসী আরজ করার পর নাস্তা ও বদনা পেশ করে অনেকগুলি দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে। লোকজন তাঁর কাছে লোটীর ঘটনা জানতে চাইলে সে উত্তর দেয় যে, দু’দিন আগে আমি কোদালা পাহাড়ে লাকড়ী কাটতে যায়। আমার নিয়ত ছিল এই লাকড়ী বিক্রি

করে কিছু নাস্তা নিয়ে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে হযরত কেবলার খেদমতে যাব। লাকড়ী কাটার পর এক গাছ তলে বসে বোঝা বাঁধতে ছিলাম। হঠাৎ এক বাঘ আমার উপর আক্রমণ করে বসে। আমি নিরুপায় হয়ে উচ্চারণ করলাম, “ইয়া গাউসুল আ'যম (রা.)!” সঙ্গে সঙ্গে বিজলীর মত দ্রুত বেগে এই বদনা (লোটা) বাঘের মুখে পড়ে আঘাত করে। এতে বাঘ ভয় পেয়ে জঙ্গলের দিকে পলায়ন করে। আমি বদনা (লোটা) দেখা মাত্র চিনতে পারলাম যে, ইহা আমার মুরীদ কেবলা হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.) এর অয় করার বদনা (লোটা)। ভক্তি সহকারে ইহা নিয়ে বাড়ীতে আসি এবং আজ শুকরিয়া এবং কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য এই বদনা (লোটা) নিয়ে হযরতের চরণ যুগলে উপস্থিত হই।

হযরতের আদেশে রিয়াজুদ্দীন উকিলের ভূসম্পত্তি খরিদ ও রেয়াজুদ্দীন বাজারের পত্তন: একদা চট্টগ্রাম নিবাসী রেয়াজুদ্দীন উকিল সাহেব হযরতের খিদমতে উপস্থিত হয়ে অভাব অনটন হতে পরিচ্রাণের জন্য দো'আ প্রার্থনা করলেন। হযরত কেবলা (রা.) বললেন, যুগিনীর জায়গা খরিদ কর, তথায় শহর আবাদ হবে। তোমার আর্থিক অনটন থাকবে না। তিনি বাড়ীতে এসে ভাবতে লাগলেন, কোন যুগিনীর জায়গা তিনি খরিদ করবেন। টাকা পয়সা তেমন নেই। কিছুদিন পর এক যুগিনী এসে তাঁর কাছে বর্তমান রেয়াজুদ্দীন বাজার অবস্থিত সেই জায়গাটি বিক্রয় করতে চাইলে তিনি হযরতের নির্দেশ মত বিনা দ্বিধায় অল্প মূল্য দিয়ে ওই জমলাকীর্ণ জায়গা খরিদ করলেন। কিছুদিন পর ওই জায়গার দক্ষিণ পাশে রেলওয়ে কোম্পানী এসে ঘোষণা করার মানসে জরিপ করতে লাগলেন। দিনদিন জায়গার গুরুত্ব বাড়তে লাগল। তিনি সেখানে বাজার পত্তন করলেন। ক্রমে চন্দনপুরা মোহছলিয়া পাহাড় হতে চট্টগ্রাম কেট ও বর্তমান (আদালত ভবন) কাছাড়ী পাহাড়ে এসে পড়ে। কাজেই তাঁর বাজার অত্যন্ত চলু ও উন্নতিশীল হয়ে গেল। ক্রমাগতই তাঁর অবস্থার অপ্রত্যাশিত উন্নতি হতে লাগল।

ইছজগত হতে পর্দা করা: হযরত কেবলা (রা.) ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হিজরী ১৩২৩ সনে বাংলা ১৩১৩ সালে ১২৬৮ মযীর ১০ মাঘ মোতাবেক ২৭ জিলকুদ রোজ সোমবার দিবাগত রাত্রি দেড়টার সময় ইছজগত হতে পর্দা করে আল্লাহ ও রাসুল (দ.) এর সন্নিধ্যে গমন করেন।

‘আল ওয়ালাদু সিরকুন জে আবিহে’: ছেলে সন্তান বাপের, ছাত্র ওস্তাদের, মুরীদ পীর মুরশিদের রহস্য স্বরূপ। অতএব গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী হযরত মাওলানা শাহ সৈয়দ আহমদুল্লাহ (রা.) এর খোলাফা (খলিফাগণ) দেশ বরেণ্য সুবিখ্যাত ও অদ্বিতীয় অভুলনীয়। এখানে হযরতের অগণিত খলিফাগণের মধ্য

হতে বিশেষ করে কজনের নাম প্রদান করা গেল।

১. গাউসে জমান গীরে ফা'আল হযরত গোলামুর রহমান বাবাজান কেবলা মাইজভাওয়ারী (রা.)।

২. হযরত মাওলানা শাহ্‌ ওছিউর রহমান (রা.), চরন্দীপ।

৩. হযরত মাওলানা শাহ্‌ আবুছালাম (রা.), ভূজপুর।

৪. হযরত মাওলানা শাহ্‌ আবুল গণী (রা.), কাঞ্চনপুর।

৫. হযরত মাওলানা শাহ্‌ আবুল হাদী (রা.), কাঞ্চনপুর।

৬. হযরত মাওলানা শাহ্‌ আমিনুল হক (রা.), ফরহাদাবাদ।

৭. হযরত মাওলানা শাহ্‌ কাজী আহাদ আলী (রা.), আহল্লা।

৮. ওহীয়ে গাউসুল আ'যম হযরত মাওলানা শাহ্‌ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাওয়ারী (রা.)।

আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ভাষ্যকোষ
কোরাম, দ্বিতীয় খণ্ড থেকে সংকলিত।

পূর্ব আকাশে রবির উদয় তাঁধার হল বিলয়: গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়ারী প্রসঙ্গ

হযরতুলহাজ্ব আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী

প্রাক্কথা: আল্লাহ পৃথিবী ও মহাকাশের সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন তাঁর শ্রিয় মানবসমাজের সার্বিক সুবিধার জন্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষ নিয়ে যে সমাজ সেটাই হল বিশ্ব সমাজ। বিশ্ব সমাজের অন্তর্ভুক্ত যে সকল মানুষ আল্লাহর প্রভুত্বকে স্বীকার করে তারা যেমন আল্লাহর বিভিন্ন নেয়ামত আলো, বাতাস, খাদ্য প্রভৃতি ভোগ করে থাকে, তেমনি যারা আল্লাহর প্রভুত্বকে অস্বীকার করে তারাও নেয়ামত ভোগ করে। কারণ বেঁচে থাকার জন্যই মানুষ জন্মগতভাবে মহান আল্লাহর সৃষ্টি জগতের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ গ্রহণের এবং সুযোগ-সুবিধা ভোগের সমান অধিকারী। বিশ্বমানবের এ সকল দৈহিক প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের নৈতিক ও রূহানী প্রয়োজন মেটানোর যথারীতি ব্যবস্থা নিয়েছেন। মানুষের সকল প্রকার দৈহিক, নৈতিক ও রূহানী কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এ সকল নবী-রাসূলগণ মানবসমাজকে বৈষয়িক উপায়-উপকরণ ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদের নৈতিক ও রূহানী উন্নয়নের জন্য মহান আল্লাহর আদেশে পস্থা নির্দেশ করেছেন। এভাবে নবী ও রাসূলগণের নির্দেশিত জীবনযাপন প্রণালী প্রচলনের মাধ্যমে মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে। এবং বিশ্বের সকল মানুষের জন্য প্রেরিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমাদ মোজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান চূড়ান্তরূপে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে বিশ্বসমাজের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো বাস্তবরূপে পরিগ্রহ করে। সেই পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা অবলম্বন করে সোনালি যুগের (খোলাফায়ে রাশেদার যুগ) মানবসমাজ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সুখ শান্তি সমৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাপন করেছেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে, দর্শনের বিকৃতির কারণে সেই পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন প্রক্রিয়া আল্ ইসলাম বাহ্যিক রূপসর্বশ আত্মাহীন পুতুলে পরিণত হতে থাকে। সেই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য মহান প্রভু ইসলামের প্রতিষ্ঠার প্রায় পাঁচশত বছর পর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রা.) মহিউদ্দীন তখা ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবনকারী নবুয়তের ছায়াধারী বেলায়ত শক্তির সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গাউসুল আ'যম হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁর কর্ম সাধনায় আবার ইসলামী জীবনযাপনে মানুষ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধির ছায়া পেতে

থাকে। সময় আপন গতিতে গড়াতে থাকে। দিন-মাস-বছর-যুগ-শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আবাবও ইসলাম নামক জীবনযাপন প্রণালীটি সংকুচিত, কাদাযুক্ত, প্রশ্ণবিশিষ্ট, প্রাণহীন হতে থাকে। তাই গাউসুল আ'যম বড়পীর জিলানীর ছয়শতাধিক বছর পর ইসলামের প্রাণসঞ্চালনকারী হিসেবে পূর্বাঞ্চলের মাইজভাণ্ডার নামক স্থানে ১২৪৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৮ ময়ী, ১৮২৬ দিসারী, ১২৩৩ বঙ্গাব্দ ১ মাঘ বুধবার অপরাহ্নে জন্মলাভ করেন আহমাদী বেলায়ত ক্ষমতার রাণ্ডারদার উদার যুগলায়ক, কুতুবে রকানী, মাহবুবে ইয়াযদানী গাউসুল আ'যম হযরত মাওলানা শাহসূফী সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)। তাঁর মহামতি পিতার নাম সৈয়দ মতিউল্লাহ (রা.)। মাতার নাম সৈয়দা খায়রুন্নিছা (রা.)। তাঁরা উভয়েই পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ফটিকছড়ি উপজেলার ইছাপুর মহকুমার আজিমনগর মৌজার (গ্রামের) অধিবাসী ছিলেন। তাঁরা উভয়েই রাসূল (দ.) বংশোদ্ভূত সৈয়দ ছিলেন। রাসূল (দ.) আনীত পালিত ধর্ম ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রচার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন তাঁরই বংশধর সৈয়দগণ। তাঁদের স্বভাবজাত দায়িত্ব পালনে সুদূর জাজিরাতুল আরব থেকে গৌড় নগর হয়ে তাঁরা উক্ত স্থানে বসতি স্থাপন করেন।

শিক্ষা অর্জনে মাইজভাণ্ডারী হযরত: শিশুকাল থেকে মাতা পিতার তত্ত্বাবধানে থেকে প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি লাভ করেন। নিজ-গ্রামেই আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর উচ্চশিক্ষার নিমিত্তে ১২৬০ সনে সুদূর পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা আলীয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন শুরু করেন। হিজরী ১২৬৮ সনে কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, তাফসীরসহ ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণকল্পে সর্বপ্রকার কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেন এবং সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন।

অর্জিত জ্ঞান বিতরণে হযরত গাউসুল আ'যম: “তায়্যারুল ইল্মা ওয়াল্লিমুল্লাহা”। বিশ্বের মহান শিক্ষক বিশ্বনবী (দ.) এর উক্ত শ্লোগান-তোমরা জ্ঞান অর্জন কর এবং তা মানুষকে শিক্ষা দাও’ অনুসরণের তগাদায় ১২৭০ হিজরী কলিকাতার মাটিয়া বুরুজে মুন্সি বু আলী মাদরাসায় প্রধান মোদাররিছ হিসেবে শিক্ষকতার পেশায় যোগদান করেন। এবং কুরআন, সুন্নাহসহ সামগ্রিক শিক্ষাদানে নিজে থেকে নিয়োজিত রাখেন। অবশ্য এর পূর্বে মাদরাসা শিক্ষা শেষে যশোর কাজীর পদে কিছুকাল সফল দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

দীক্ষা গ্রহণে হযরত কেবলা: মাদরাসায় শিক্ষকতাকালীন তিনি পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সোবহানী গাউসুল আ'যম মাহিউদ্দিন শেখ সৈয়দ আবদুল কাদির

লাহোরীর দস্তে বায়াত গ্রহণপূর্বক আধ্যাত্ম সাধনায় নিয়োজিত হন। পীরের নির্দেশে হযরত আবু শাহমা (ক.) এর অগ্রজ চিরকুমার শাহসূফী সৈয়দ দেওয়ান আলী পাকবাজ মুহাজিরে মাদানী এর সোহবতে তিনি এতেহাদী কুতুবীয়ত এর ফয়েজও হাসিল করেন। এই দুইজন মহান ওলীর সংস্পর্শ থেকে ফয়জ বরকত আহরণের লক্ষ্যে বায়াত গ্রহণের সময় হতে প্রায় পাঁচ বছর যাবতকাল কলিকাতায় তিনি অতিবাহিত করেন। ১২৭৫ হিজরী সনে স্বহাস্য মাইজভাণ্ডারে ফিরে এসে কিছুকাল পর্যন্ত বিভিন্ন মাহফিলে ও মজলিসের মাধ্যমে হিদায়ত কার্য পরিচালনা করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি স্বীয় আস্তানা শরীফে নিরবচ্ছিন্ন ঐকান্তিকতায় আধ্যাত্ম সাধনায় নিজে থেকে নিয়োজিত রাখেন। ক্রমাগত অর্জিত বেলায়তী ক্ষমতার অনন্য দীপ্তি সন্নিহিত এলাকা ছাড়িয়ে বিকশিত হয়েছিল সর্বত্র।

দর্শন প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট: হযরত গাউসুল আ'যম শাযখ সৈয়দ মাহিউদ্দিন আবদুল কাদির জিলানী (রা.)'র বিনালের ছয়শতাধিক বছর পর সময়ের বিবর্তন ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তির ফলে শরীয়তী ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। সমাজব্যবস্থা ক্রমাগত অচল ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে থাকে। ইসলামী ভ্রুকুমতের অনুপস্থিতিতে শরীয়ত বা বিধান ধর্মের আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিবিধ শ্রেণীর আলোম-ওলামাদের মধ্যে মতানৈক্য ও বাদানুবাদ শুরু হয়। ফলে মুসলিম সম্প্রদায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ফিল্মো ফ্যাসাদে লিপ্ত হয়ে যায়। এমন সন্ধিক্ষণে মুসলিম সমাজের মধ্যে একা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিয়ে বিতর্ক না করে ধর্মের মূলকথা নৈতিকতার বিকাশ সাধনার মানসে নৈতিক ধর্মের উপর গুরুত্বরোপকারী বেলায়তে মোতলাকায় আহমাদী (অর্গলমুক্ত ও সর্ববৈধনকারী ভাবধারার বেলায়ত শক্তি) প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বেলায়তে মোতলাকা, বিধান ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি খোদার ইচ্ছাশক্তি এবং মানুষের আত্মিক উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্বরোপ করে। সুতরাং সময়ের প্রয়োজনে হযরত গাউসুল আ'যম মাওলানা শাহসূফী সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (রা.) পবিত্র ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের উপর হস্তক্ষেপ না করে নৈতিক ধর্মের মাধ্যমে খোদার দিকে আব্বান জানান এবং আল্লাহর বাতেনী শাসন পদ্ধতির প্রাণনুযায়ী সমুচিত হিদায়ত ও শক্তিশালী ত্বরিকতের প্রভাবে প্রভাবিত করে জগদ্বাসীকে অন্ধকার থেকে সহজতম উপায়ে আলোর পথে আনার জন্য মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা-দর্শনের প্রবর্তন করেন। এর অনুসারী নবী করিম (দ.) এর যোগ্যতম প্রতিনিধি হিসেবে বিকাশ লাভ করতে সক্ষম।

অন্য স্বতন্ত্র মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা: হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.) বেলায়তের সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন আকলে কুত্বির অধিকারী ছিলেন। এ স্তরের বেলায়ত বাধাহীন, সর্ববেষ্টনকারী বেলায়তী শক্তিসম্পন্ন। এ স্তরে উপনীত হলে বান্দা স্রষ্টাঐদত্ত সকল জ্ঞানের অধিকারী হয়। এ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তাঁর পীর মুর্শিদের ধারায় কাদেয়ীয়া ত্বরিকা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বেলায়তে মোতলাকারে আহমদি যুগের চাহিদা অনুযায়ী তিনি কুরআন হাদিস ও হিকমত বা কৌশল অবলম্বন করে যুগোপযোগী একটি মহাসাগররূপী স্বতন্ত্র ত্বরিকা-দর্শন প্রবর্তন করেন, যা মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা-দর্শন নামে সুপরিচিত। এ ত্বরিকা একটি যুগোপযোগী দর্শন হিসেবে বিশ্বের সকল ধর্মের মানুষের কাছে বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা শরীয়ত বিরোধী নয়। হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর ফয়েজ ও প্রভাবে পরিচালিত অজস্র খলিফা বাংলাদেশের সর্বত্র বিদ্যমান, যাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চ মর্যবর ওলী হন। তাঁরা বেলায়তে মোতলাকা অনুযায়ী মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা অবলম্বনে হিদায়তের কাজ আশ্রম দেন। হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিভিন্ন ত্বরিকা অবলম্বনকারীদের নিজ নিজ ত্বরিকায় বহাল রেখেও নিজ বেলায়তী ধারা বা পদ্ধতি অনুযায়ী ফয়েজ বিতরণ করতে সমর্থ। এ উম্মুক্ত বেলায়তি ধারাই মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা হিসেবে অভিহিত। এ দেশের সমগ্র জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্রীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে উদ্ভাবিত এ ত্বরিকা, যা সর্বাধুনিক ও সর্বশেষ। এজন্য এ দেশবাসী অবশ্যই সৌভাগ্যের দাবীদার। মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকায় শরীয়ত, ত্বরিকত, হাকীকত, মারিকত এক কথায় ধ্বীনে ইসলামের প্রতিটি দিক অতি সুন্দরভাবে সমন্বিত করা হয়েছে।

বন্দেগীতে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী: হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী হযাতে কোনদিন এক ওয়াক্ত নামাজও কুজা করেননি। যথাসময়ে নামাজে পাঞ্জানা আদায় করতেন। বেশী বেশী নফল নামাজ ও নফল রোজা রাখতেন। বাকী সময় কুরআন তিলাওয়াত, শিক্ষা ও দ্বীন চর্চায় কাটাতেন।

অলৌকিক ঘটনাবলীর কিঞ্চে পরিচয়: হযরত কেবলা (ক.) নিজেকে গোপন রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তবুও আল্লাহর মুখ্য উদ্দেশ্য ও বেলায়তী শানকে বিকশিত করার জন্য এবং খোদার প্রতি মানবজাতির বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেম জাগিয়ে তুলে তাদের সুপথে ও গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর অনেক কারামাত বা অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ সকল কারামাত খোদার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হতো। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবে এদেশের অলিতে গলিতে, মাঠে ঘাটে, সর্বত্র অলৌকিক ঘটনা ও কারামাত বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। দেশবাসীর মুখে ও অন্তরে তাঁর আত্মার প্রভাবজনিত যে সমস্ত কারামাত

বিশেষায়িত ও বিজড়িত হয়েছে তা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। তাঁর ব্যাপ্তি ও শক্তি সম্পর্কে কিঞ্চে উপলব্ধি করার মানসে কয়েকটি কারামাতের শিরোনাম বর্ণিত হলো। যেমন- হযরত আদম (আ.) এর সাথে হযরতের আধ্যাত্মিক যোগসূত্র, আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে বাড়িতে থেকে মক্কা-মদিনা ভ্রমণ, লাঠির প্রহারে মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার, বিনা ঔষধে হস্তপীড়া ও ক্ষতনালী রোগ থেকে মুক্তি, খান বাহাদুর ফজলুল কাদেরের প্রতি রহমত বর্ষণ, সূর্যের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব, সাগর গর্ভে হযরতের প্রভাব, চট্টগ্রাম মোহাছেলীয়া মাদরাসা (মহসিন কলেজ) ও নাজিরহাট আহমদিয়া মাদরাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠায় হযরতের প্রভাব, কবরে মুনকার-নকির সম্পর্কে হযরতের তহাবরোফাত, ওফাতের পরে হযরতের প্রত্যক্ষ দর্শন দান, হযরত খিজির (আ.) এর সঙ্গে হযরত কেবলার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের নিদর্শন, নিখল্যা বৃক্ষে ফল দান, বন্য জন্তু এবং কীট প্রভৃৎ থেকে ফসল রক্ষা, বেলায়তি ক্ষমতায় সম্ভাবনাদান, অস্ত্র খাদ্যে অনেক লোকের আপ্যায়ন, অস্ত্র দ্রব্য অসংখ্য লোকের মধ্যে বন্টন, সাগর ভ্রুবিতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার, ডুবন্ত স্টীমারকে নিরাপদে উদ্ধার, অলৌকিকভাবে বাঘের মুখে লোটা নিক্ষেপে ভক্ত উদ্ধার, বাঘের হঠাৎ আক্রমণ থেকে ভক্ত উদ্ধারে অলৌকিক উপস্থিতি, মৃত্যুকালে আজরাঈল ফেরত এবং আয়ু বৃদ্ধি, লাঠির আঘাতে খালের গতি পরিবর্তন, নানা বিপদে আপদে উদ্ধার ও দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি প্রভৃতি অসংখ্য কারামাতাবলী সর্বজন বিদিত।

হযরত গাউসুল আ'যম'র মুখনিপুত মণিমুক্তার ক'টি: (ক) “নবী করিম (স.) এর নিকট দুটি টুপি ছিল, তিনি একটি আমার মাথায় এবং অপরাটি হযরত পীরানে পীর ছাহেবের মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন।” এ অমূল্য ঘোষণার মাধ্যমে গাউসুল আ'যম একজন কিংবা দু'য়ের অধিক বিতর্কের দ্বার রুদ্ধ করা হয়েছে। (খ) “হাশরের দিন আমি প্রথম বলিব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” যারা মাইজভাণ্ডারীদের শিরিক-কুফরের অপবাদ দেয় তাদের উত্তর প্রদত্ত হয়েছে। (গ) “কবুতরের মত বাছিয়া খাও।” কবুতর শান্তির প্রতীক আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি পেতে চাইলে শরীয়ত নির্ধারিত হালাল হারাম বেছে চলা উচিত; এমন শিক্ষাই এখানে প্রদত্ত হয়েছে। (ঘ) “কুরআন শরীফ তিলাওয়াত কর।” কুরআন সমুদয় বিষয়ের বিশদ বর্ণনা সমৃদ্ধ অর্থাৎ সকল সমস্যা কুরআনিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সমাধান সম্ভব। (ঙ) “ছালাতুত তাছবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায পড়।” যা নফল নামাজ। (চ) “আইয়ামে বীজের রোজা রাখ, আমার ছেলেরা সব সময় রোজা রাখে।” উক্ত বাণী দ্বারা অপপ্রচারের প্রতিরোধ করা হয়েছে। যেখানে মুস্তাহাব রোজা রাখার তাগাদা আছে সেক্ষেত্রে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত রোজাকে অস্বীকারের প্রশ্নই অবান্তর। আর শেষোক্ত বাণীর জীবন্ত পরিচায়ক হযরত বাবা

ভাওয়া। তিনি সাধনা অবস্থায় সারা বছরই রোজা রেখেছেন। তাহাজ্জুদ নামাজসহ বিবিধ নফল নামাজে রত থাকতেন। (ছ) “নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের হাতে পাকানো খাইওনা।” উক্ত রূপক বাণী দ্বারা পরিনির্ভরশীলতা পরিহার করে কর্মতৎপর হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

পরমাত্মার সাথে মহামিলন: সৃষ্টির মহানীতি অনুসারে হযরত গাউসুল আ'যম শাহসুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজুভাওয়া (ক.) ৭৯ বছর বয়সে সকলকে দৃশ্যত অনুপস্থিতির শোকে জর্জরিত করে ১৩১৩ বিসম্বদ মতানুসারে ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১০ মাঘ (হিজরী ১৩২৩ সনের ২৭ জিলকদ, ১৯০৬ ইংরেজী, ১২৬৮ মঘী) সোমবার দিবাগত রাত একটার সময় তাঁর পরম প্রিয়তম একমাত্র মাহবুব মহান আল্লাহর সাথে গুভমিলনের জন্য বিশ্ববাসীকে ছেড়ে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে আত্মগোপন করে পরমাত্মার সান্নিধ্যে পবিত্র অমরধামে গমন করেন (ইল্লালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাহি রাজিউন)। তবে বিশ্বমানবকে এ কথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, তিনি এরপরও সর্বকালে সর্বস্থানে আলোকিত এবং তাঁর ঐশী প্রেমের আকর্ষণে খোদা প্রেমের সাগর সদা জোয়ার-মহিমায়িত, প্রেমের বাগিচা চির বসন্তে উজ্জীবিত।

লেখক: প্রধান মুহাম্মদিস: জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, যোলশহর, চট্টগ্রাম।

গাউসুল আ'যমের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব

এস এম জাম্বর ছাদেক আল আহাদী

‘গাউসুল আ'যম’ শব্দদ্বয়ের অর্থ হল, ‘বিশেষ শ্রেষ্ঠ গাউস বা বিশিষ্ট গাউস’। এখানে ‘আল আ'যম’ শব্দটি ইসুমে তাফহীল (অন্যের তুলনায় অধিক মর্যাদা বোধক বিশেষ্য) আলিফ-লাম যোগে ব্যবহৃত হওয়ার দরুণ এটির অর্থ হবে- ‘বিশেষ শ্রেষ্ঠ বা বিশিষ্ট’। আর ‘গাউস’ বলতে পারিভাষিক ‘গাউস’ই বুঝানো হয় বিধায় এটির অর্থ ‘গাউস’ই হবে। পক্ষান্তরে ‘গাউস’ শব্দ থেকে ‘সাহায্যকারী’ বা অনুরূপ কোন অর্থ গ্রহণ এখানে বর্জিত হতে বাধ্য। কেননা ‘সাহায্যকারী’ বা অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া, একযোগে প্রতিটি মানুষের জন্যই সম্ভব বিধায় ঐরূপ অর্থে প্রতিটি মানুষই ‘গাউস’ হয়ে দাঁড়ানোর মতো ত্রিকটাই অবধারিত করে। তাই ঐরূপ বিপত্তি অবধারিত করে এমন অর্থ গ্রহণের অন্যায়তা এখানে সুস্পষ্ট। উদাহরণতঃ ‘সালাত’ মর্মে শরীয়তের নির্দিষ্ট বিধানকে বুঝানোর ক্ষেত্রে যেমন অভিধানিক অর্থ বর্জিত হয়; তদ্রূপ ‘গাউস’ মর্মে পারিভাষিক ‘গাউস’ই বুঝানো হয় বিধায় এক্ষেত্রেও অভিধানিক অর্থ বর্জিতই হবে।

আর ‘বিশেষ শ্রেষ্ঠ বা বিশিষ্ট’ অর্থেই যে, ‘আল আ'যম’ শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, তা ‘ইসুমে তাফহীল’ের ব্যবহার বিধি অবগত আছে এমন ব্যক্তি মাত্রই তৎপ্রতি মনোযোগী হলে বুঝতে বেগ পেতে হয় না। তাছাড়া বাস্তবতার নিরিখে সর্বসাধারণও বুঝতে সক্ষম হবেন যে, ‘গাউসুল আ'যম’ শব্দদ্বয়ের অর্থ ‘বিশেষ শ্রেষ্ঠ বা বিশিষ্ট গাউস’ই হবে। অন্যথায় সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিংবা সকল গাউসের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থে অভিধানিক প্রয়োগ সর্বজন স্বীকৃত প্রথম গাউসুল আ'যমের বেলায়ও যথার্থ হবে না। উদাহরণতঃ ঐতিহাসিক সত্য যে, হযরত গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল কাদের জীলানী রাধিয়াল্লাহু আনহুই হন, উক্ত অভিধায় বিভূষিত সর্বপ্রথম সত্তা। অথচ গাউসুল আ'যম অভিধায় বিভূষিত না হয়েও গাউসিয়াতের ধারক ও শাহানুশাহে বেলায়ত হযরত মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ্জাহু যে, মর্যাদায় গাউসুল আ'যমের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন তা সর্বজন বিদিত। এমতাবস্থায় ‘সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিংবা সকল গাউসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গাউস’ অর্থে হযরত শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদের জীলানী রাধিয়াল্লাহু আনহুকে ‘গাউসুল আ'যম’ অভিধায় বিভূষিত করা আদৌ সম্ভব নয়। অতএব অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, হযরত ইমামুল আউলিয়া গাউসুল আ'যম শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী রাধিয়াল্লাহু আনহু বিশেষ শ্রেষ্ঠ বা বিশিষ্ট গাউস অর্থেই

গাউন্ডুল আ'যম জঁজানীর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বঃ

অর্থাৎ: 'গাউসুল আ'যয: গাউসুসাক্বালিন : শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (বেড়ঙ্গীর সাহেব) এর উপাধি'। আর এহেন স্বীকৃত উপাধি হওয়া সূত্রে সুস্পষ্ট যে, 'গাউসুল আ'যয' অভিধা-উপাধি ধারাবাহিক সমাধীন যোগ্য বেলায়েতের ত্তর বিশেষ কোন পদবী আদৌ নয় ।

2b

গাউন্সুল আশ্রম জিলানী রাধিয়াত্বাৎ আনন্দ্র কুপমঃ

५७

কুদম সকল ওলীযুল্লাহর কাঁধের উপরে'। অতঃপর তাঁর যুগস্থওলীগণের কাঁধ তাঁর জন্য বুকোতে যাবে; কেননা তাঁর যুগে তিনিই তাঁদের কুতুব। অতএব তোমাদের মধ্যকার কেউ ঐ সময়ে থাকলে সে যেন তাঁর খেদমত অবশ্যই করে' (বাহ্জাতুল আসরার; বাইরুত-লেবনান মুদ্রিত: ১৬ পৃষ্ঠা)।

দুই. শায়খ আবু নাজীব আবদুল ক্বাহের সাহরোওয়ারদী বলেন :

كنت عند الشيخ حماد بن مسلم الديلمي رضي الله عنه ببغداد سنة ثلاث وخمسمائة والشيخ عبد القادر بن محمد في صحبته فبدأ فجلس بين يديه متادياً ثم قام فسمعت الشيخ حماد يقول بعد قيام الشيخ عبد القادر: لهذا المصطفى قدم تعلم في وقتنا على رقاب الأولياء في ذلك الوقت وليؤمن أن يقول: قد علمي هذه على فية كل ولي الله ولو ضمن له رقاب الأولياء في زمانه-

অর্থাৎ: 'আমি (শায়খ সাহরোওয়ারদী) ৫০৩ হিজরী সালে শায়খ হাম্মাদ ইবনে মুসলিম দাব্বাস রাঈয়াল্লাহু আনহু'র নিকট ছিলাম। তখনকার সময়ে শায়খ আবদুল ক্বাহের (রাঈয়াল্লাহু আনহু) তাঁরই সান্নিধ্যে যাওয়া আসা করতেন। অতএব তিনি এসে তাঁর সামনে আদব সহকারে বসলেন, তারপর দাঁড়ালেন। শায়খ আবদুল ক্বাহের (রাঈয়াল্লাহু আনহু) এর দাঁড়ানোর পর শায়খ হাম্মাদকে বলতে শুনলাম, এ অনারবীর কুদম নিজ সময়কালীন এমন উঁচু যে, তা ঐ সময়কার সকল ওলীর কাঁধের উপরেই। অবশ্যই তিনি নির্দোষ প্রাপ্ত হয়ে বলবেন যে, 'আমার এ কুদম সকল ওলীযুল্লাহর কাঁধের উপরে'। তাঁর যুগস্থ সকল ওলীর যাড় তজ্জল্য অবশ্যই অবনত করবে' (প্রাপ্ত: ১৮ পৃষ্ঠা)।

তিন. শায়খ আবদুল ক্বাহের জীলানী রাঈয়াল্লাহু আনহু যুবক থাকা অবস্থায় স্বয়ং তাঁকে সম্বোধন করতঃ তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ গাউস বললেন :

يا عبد القادر لقد ارضيت الله ورسوله وديك 'كأنى أراك ببغداد' وقد صعدت على الكرسي منك لئلا على الصلاة، وقلت: قد علمي هذه على فية كل ولي الله، وأنى أرى الأولياء في وقتنا قد حووا رقابهم اجلا لا لك-

অর্থাৎ: 'হে আবদুল ক্বাহের! আদব-শিষ্টতার দ্বারা তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে তুষ্ট করেছ। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, বাগদাদে পূর্ণ সমাবেশে কুরসীতে আরোহণপূর্বক বক্তব্যরত অবস্থায় বলতে যাচ্ছ যে, 'আমার এ কুদম সকল ওলীযুল্লাহর কাঁধের উপরে'। আর তোমার সময়কালীন ওলীগণকে যেমনটি দেখতে পাচ্ছি যে, তোমার মর্যাদার কারণে তারা তাদের যাড়সমূহ ঝুকিয়ে দিয়েছে' (প্রাপ্ত: ১৯ পৃষ্ঠা)।

গাউসুল আ'যম মাইজভাগারীর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব :

ইমামুল আউলিয়া হযরত গাউসুল আ'যম শাহে দু'আলম সাইয়্যদ আহমাদ উল্লাহ মাইজভাগারী রাঈয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হন, অনধিক দুই গাউসুল আ'যমের শেষ সত্তা এবং প্রথম গাউসুল আ'যমেরই সমকক্ষ স্বতন্ত্র স্বাধীন গাউসুল আ'যম। এ মর্মে হযরত গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাহের জীলানী রাঈয়াল্লাহু আনহু'র নিম্নোক্ত বাণী প্রাধিকারযোগ্য। তিনি বলেন-

قال في مكنون علم الله عز وجل في زاوية عن الخلق ملك على بساط الانس والقرب جالس والملك لكل وارد من اهل عز ماني واصل من وراء الاغلاقي على بساط الانس والقرب جالس والملك للفراد من اهل عز ماني واصل من وراء الاغلاقي على بساط الانس والقرب جالس والملك لسرا حتى صار لورح ينقل اليه ما في الروح المحفوظ وسلم اليه ازمة امور اهل زمانه وصر في عظامهم ومنهم وقال له بلسان الغيب انك اليوم لدينا مكنين امين واقعد مع ارواح اهل القين على ذكر بين الدنيا والاخرة بين الخلق والخلق بين الظاهر والباطن بين ما يدرك وبين ما لا يدرك وجعل له اربعة وجوه: وجه ينظر به الى الدنيا وجه ينظر به الى الاخرة وجه ينظر به الى الخلق وجه ينظر به الى الخلق وصبره خليفة في ارضه وعوالمه فاداراه امر اقلبه من صورة الى صورة ومن هيئة الى هيئة فاطمعه على خزائن الاسرار لانه مفرد الملك وطلب لنيابه وامين مملكته في وقته ول في كل يوم وليلة لانه مستور ونظرة اليه-

অর্থাৎ- 'আমার কুলব বা অন্তরাত্মা সৃষ্টি থেকে দূরে এক কিনারায় আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের আবাসে গোপন অবস্থানে রয়েছে। তা আল্লাহ সুবহানাহুর দরজায় এক ফিরিশতা ব্যক্তিত্ব, যাকে আমার যমানাবাসীর মধ্য থেকে তথায় গমনকারী প্রত্যেকের জন্য কেবলারূপে প্রকাশ করেছেন; যা বন্ধনরাজার অন্তরালে পৌঁছে অন্তরঙ্গতা ও নৈকট্যের বিস্থানায় উপবিষ্ট। আর তা এমন অন্যতম একক বাদশাহ, যার পরম্পর সমকক্ষ এমন একজন বন্ধু বা সাথী রয়েছেন, যিনি সৃষ্টির রহস্যাবলী জ্ঞাপক; অন্তরসমূহের অবস্থাদি অবলোকনকারী। হক তা'আলা তাঁকে ভিন্নতা দেখার পঞ্জিলতা থেকে পরিষ্কর করে দিয়েছেন; এমনকি তিনি এক্ষণ তজ্জিতে পরিণত হয়ে গেছেন যাতে 'কত্রে মাহফুয'র সমগ্র বিষয় অবতীর্ণ হয়। তাঁর যমানাবাসীর সমুদয় কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ তাঁকেই সোপর্দ করলেন এবং তাদের থেকে যাকে ইচ্ছা স্বাধিকারে দান করার ও বঞ্চিত করার ক্ষমতা তাঁকে দিলেন। আর গায়বী জ্ববানে তাঁকে বললেন, 'আজ তুমি আমার নিকট মর্যাদাশালী মহাসচিব'। তাঁকে আহ্বানে ইয়াক্বীন বা সম্পূর্ণ সংশয় মুক্তদের সমূহ আত্মার সাথে দুনিয়া ও আখিরাতের

মধ্যবর্তী, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যবর্তী, ব্যক্ত ও গুপ্তের মধ্যবর্তী এবং বোধ্য ও দূর্বোধ্যের মধ্যবর্তী উচ্চাঙ্গনে বসিয়েছেন। তাঁর চারটি মুখমণ্ডল বানিয়েছেন; এক মুখে দুনিয়া, এক মুখে আখিরাত, এক মুখে সৃষ্টিকুল এবং এক মুখে স্রষ্টার দিকে দেখেন। আর তাঁকে নিজ জমিন ও জগতসমূহের মাঝে খলীফা বা প্রতিনিধি রূপে রূপান্তর করেন। যখন তাঁর বিষয়ে ইচ্ছা করবেন, তখন এক আকার থেকে অপর আকারের দিকে এবং এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থার দিকে তা পাল্টে দেবেন; অতঃপর তাঁকে রহস্যাবলীর সমূহ ভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত করবেন; কারণ তিনি সমগ্র রাজত্ব ব্যাপী একাই একজন, যিনি তাঁর সমস্ত নবীগণের নায়ক বা স্থলাভিষিক্ত এবং নিজ সময়কালে আপন বাদশাহীর জিমাশ্রাও। আর প্রতি দিনরাত আল্লাহর তিনশ'াটটি বিশেষ দৃষ্টি বা জ্যোতি বিচ্ছুরণ তাঁর প্রতি হয়ে থাকে' (বাহ্জাতুল আসরার-৫৫ পৃষ্ঠা)।

উপর্যুক্ত বিবৃতি মর্মে- হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তাঁরই সমকক্ষ বন্ধু বলে আখ্যায়িত মর্মে অনধিক দুই গাউসুল আ'যমের শেষ সত্তাকে পরিচিহিত করা যায় এমন দিকনির্দেশনাসহ তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। পক্ষান্তরে তাঁর ঐহেন সমকক্ষ বন্ধুটি যে, হযরত গাউসুল আ'যম মাওলানা শাহ সাইয়দ আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছাড়া আর কেউ নন, তৎপক্ষে বহুল তথ্যসমৃদ্ধ জোরালো ও নির্ভরযোগ্য দলিল পাওয়া যাবে যৎকর্তৃক প্রণীত 'গাউসুল আ'যম অভিধা' শীর্ষক প্রবন্ধে। তৎসঙ্গে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বানী থেকেও তা প্রতিভাত হয়। যেমন- তিনি রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বানী থেকেও তা প্রতিভাত পীর সাহেবের নামের সাথে সোনালী অক্ষরে লিখা আছে' (বেলায়তে মোতলাকা- ১০৫ পৃষ্ঠা)। (খ) 'রাহুল্লাহু রাহুল্লাহু আল্লাহি ওয়াসাল্লামাহার হস্ত মোবারকে দু'টি ভাজ (বর্ণনান্তরে দু'পা) ছিল; একটি 'ভাজ' আমার মাথায় পরিয়ে দেন, অপরটি আমার ভাই পীরানে পীর শায়খ আবদুল কাদের জীলানী সাহেবের মাথায় পরানো হয়'। (গ) 'আমি একদিন আমার ভাই পীরানে পীর সাহেবের সহিত কাবা শরীফে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলাম, রহুল করিম (দ.) এর 'ছদর' মোবারক (ছিল) এক অসীম দরিয়া, আমরা উভয়ে উহাতে ডুব দিনাম।' (জীবনী ও কেরামত-২০০ পৃষ্ঠা)।

তুলনা সূত্রে অনধিক দুই গাউসুল আ'যম :

ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে আমরা পরিজ্ঞাত যে, 'গাউসুল আ'যম' উপাধিতে বিভূষিত সর্বপ্রথম সত্তা হযরত গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল কাদের জীলানী

রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছাড়া আর কেউ নন। আর পরস্পর সমকক্ষ বন্ধু বলে আখ্যায়িত করতঃ যাকে তিনি নিজের সাথে তুলনা করেছেন, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ তাঁর সাথে তুল্য হতে পারে না। কেননা তিনি নিজেই বলেছেন-
-حسبى الله و الله حسبى
কাউকে আমার সাথে তুলনা করো না' (বাহ্জাতুল আসরার-৫২ পৃষ্ঠা)।

এতে করে হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে মান্যকারী কারো পক্ষে তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই বলার যেমন সুযোগ নেই তেমনি উল্লেখিত একজন তথা হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছাড়া অপর কাউকে তাঁর সাথে তুলনা করার সুযোগও নেই। অতএব দুয়ের কমাবেনি 'গাউসুল আ'যম' বলা তথা মাত্র একজন কিংবা দুয়ের অধিক ৩,৪,৫ থেকে ১৭ জন কিংবা প্রতি যুগে একজন করে অসংখ্যজন বলাটা প্রকৃতপক্ষে তাঁকে অমান্য করারই নামান্তর। আর উল্লেখিত দুই গাউসুল আ'যম পরস্পর সমকক্ষ হন বিধায় এখানে কারো আপেক্ষিক অনুপাতিকের প্রতারণাও চলতে পারে না। অন্যথায় গাউসুল আ'যমিয়ত এর ক্ষেত্রে আপেক্ষিক অনুপাতিকের কথা বলে যারা গাউসুল আ'যমের সংখ্যা দুয়ের অধিক বৃদ্ধি করতে যাবে, তাদের আনুপাতিক অধোগতির শেষ অনুপাত কল্পনাতে নিম্নমানেই গিয়ে দাঁড়াবে।

সর্বোপরি কথা হল, পরস্পর সমকক্ষ অনধিক দুই গাউসুল আ'যমের উভয়েই পরস্পরকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন, যাতে একজনকে বাদ দেওয়া কিংবা দুয়ের অধিক সাব্যস্ত করা কোনটাই আদৌ সম্ভব নয়। কেননা সাব্যস্ত হয়েছে যে, পরস্পর সমকক্ষ এ দু'সত্তাই মাত্র পরস্পর সমতুল্য অপর কেউ নয়, এ দু' সত্তার একইরূপ মর্যাদার অবস্থানে অপর কারো স্থান নেই, নামও লিখা নেই, অনুরূপ মর্যাদার তাজদারী ও অপর কেউ নেই। অতএব উভয় গাউসুল আ'যমেরই অসংখ্য কেরামতাবলীসহ সুমহান বেলায়তের প্রভাব সমৃদ্ধ অভিমতের বিপরীতে অধঃগুন করো ভিন্নমতের মূল্য সত্যসঙ্গালীদের নিকট থাকতেই পারে না।



হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাঞ্জারী র প্রশংসায় ইমামে আহলে সন্নাত হযরত শেরে বাংলা রাহিমাহুল্লাহ

এস এম জাক্বার ছাদেক আল আহাদী

হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাঞ্জারী (রা.)'র প্রশংসা করে শেষ করা বা চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রশংসা সাধ্যাতীত। এমন অভিব্যক্তি স্বরূপ ইমামে আহলে সন্নাত হযরত শেরে বাংলা (র.) বলেন, 'তঁার প্রশংসার শক্তি কী এ অধম আযীয কখনো রাখে? 'দিওয়ানে আযীয' গ্রন্থে ক্ষুদ্র পরিসরে সুবিশাল অর্থবহ প্রশংসা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে তিনি এ অভিব্যক্তি একাধার করেন। অথচ দিওয়ানে আযীযে সে সুবর্ণবক্তব্যটুকুর ন্যায় অর্থানুবাদ না করে অন্যায় অর্থানুবাদ করতে পারলেই যেন কোন কোন উত্তরসূরীর মন ভরে! তবে এক্ষেত্রে সংশোধনী আনার মানসিকতা যাঁদের রয়েছে, তাঁরা 'মুক্তিধারা' ১০ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী ২০১১ খ্রি. সংখ্যা দেখে নিতে পারেন। উক্ত প্রকাশনাস্থ বিস্তারিত আলোচনা এখানে তুলে ধরার সুযোগ নেই বিধায় শুধুমাত্র 'ন্যায় অনুবাদ অংশটুকু একান্ত জরুরী টীকা সহ' তুলে ধরা হচ্ছে।

ন্যায় অনুবাদ: (শিরোনাম) "কুতুবের আলম, গাউসুল আ'যম, পাকিস্তান রাজাধিরাজ, খোদার পরিচয় লাভকারী আরিক-ওলীমুল্লাহগণের ক্বা'বা, কাশফ ও কারামাতের ভাঞ্চার, সমূহ ফয়য বা কল্যাণধারার উৎস, কামালাতের (আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা সমূহের) উৎসস্থল, উঁচু মর্যাদাসমূহের মালিক হযরত মাওলানা শাহ খাজা আহমদ উল্লাহ আল ক্বাদেদী মাইজভাঞ্জারী চটিগামী আলোহিহি রাহমতু রাবিবিল বা-রী'র প্রশংসায়।"

টীকা: তিনি শুধু পূর্বাঞ্চলের জন্য নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যই গাউসুল আ'যম হন মর্মে যথার্থ স্বীকৃত অভিমতটি হযরত শেরে বাংলা (রহ.) কর্তৃকও সমর্থিত প্রতিভাত হয়- এখানে 'কুতুবের আলম-গাউসুল আ'যম' পদবী-অভিধার উল্লেখ সূত্রের। অতএব হযরত শেরে বাংলা (রহ.)'র বরাত দিয়ে তাঁকে পূর্বাঞ্চলের জন্য গাউসুল আ'যম যারা বলে থাকে, তারা অন্যায় অর্থানুবাদের মাধ্যমে অপবাদই দিয়ে থাকে বৈকি!

(১ম পঙ্ক্তি)- "পাকিস্তানের ওই রাজাধিরাজের জন্য অজ্ঞ হাজার প্রশংসাবাদ; যিনি আমাদের খাজা (মনিব-অধিপতি-অভিভাবক), যাঁর নাম (হযরত) আহমদ উল্লাহ, অভিধা গাউসুল আ'যম (রাহিমাহুল্লাহ তা'আলা আনহু), তাঁরই নিমিত্তে প্রশংসাবাদ।"

শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাঞ্জারী গ্রন্থ প্রবন্ধ সম্ভার

(২য় পঙ্ক্তি)- "তঁার এ (গাউসুল আ'যম) উপাধি শাহানুশাহে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান দরবার থেকে এসেছে এমন সুসংবাদ আউলিয়া-ই কিরামের মুখে (আলোচনায়) শুনা গিয়েছে।"

টীকা: প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রশংসিত হযরত কিবলার উপাধি 'গাউসুল আ'যম' হওয়া, সে উপাধি শাহানুশাহে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত হওয়া এবং তদ্বিষয়ক সুসংবাদ আউলিয়া-ই কিরামের মাধ্যমে হযরত শেরে বাংলা (রহ.) জ্ঞাত হওয়া এখানে সুপ্রমাণিত। অতএব হযরত শেরে বাংলা (রহ.)'র বরাত দিয়ে তাঁকে পূর্বাঞ্চলের গাউসুল আ'যম মর্মে 'গাউসুল আ'যম মাহশরেকী' বলা এবং উপাধিটি শেরে বাংলা হুজুর কিংবা গাউসুল আ'যম জীলানীরই প্রদত্ত বলে অলীক দাবী ও উদ্ভট গল্প (গাউসুল আ'যম জীলানী (র.)'র সংস্কার ও তারিক: ইত্যাদি) সুস্পষ্ট সত্যের অপলাপ এবং হযরত শেরে বাংলা (রহ.)'র উপর জঘন্য অপবাদ বৈকি!

(৩য় পঙ্ক্তি)- "তঁার আবির্ভাবের কারণে বাংলা মূলক (বাংলা ভাষাভাষীদের আবাসভূমি) পরিপূর্ণ আলোকিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর প্রশংসার শক্তি কি এ অধম আযীয কখনো রাখে?"

টীকা: 'তঁার প্রশংসার শক্তি কি এ অধম আযীয কখনো রাখে?' উক্তিটি প্রসঙ্গতঃ বিশেষ লক্ষণীয়। প্রশংসিত হযরত কিবলার প্রশংসা করে শেষ করা বা চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রশংসা, গ্রন্থকার মহোদয় কর্তৃক কোনকালেই সম্ভব নয় এমন অভিব্যক্তিই এখানে প্রতিভাত হয়। অতএব হযরত কিবলার যেরূপ প্রশংসা হযরত শেরে বাংলা (রহ.) বর্ণনা করেছেন, মূলতঃ তিনি তারও বহু উর্ধ্বে।

(৪র্থ পঙ্ক্তি)- "ওহে আমার মা'বুদ! তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন! মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র উসিলায় এ প্রার্থনা কবুল করুন!"

(৫ম পঙ্ক্তি)- "হযরত শাহ আহমদুল্লাহ ক্বাদেদী (রাহিমাহুল্লাহ তা'আলা আনহু) পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী কুতুবুল আক্বতাব।"

টীকা: (১) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'ক্বাদেদী' শব্দের যথার্থ মর্ম উপলব্ধিতে বার্থ কতিপয় লোক মাইজভাঞ্জারী ত্বরীক্বার স্বাতন্ত্র্যকে প্রমুখিক করে। তাদের উদ্দেশ্যে বলতে হয়, ত্বরীক্বতের সিলসিলাগত পূর্বাধারাবাহিকতায় হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী (রাহি.), জুনাদী-সক্কাহী হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে একটি স্বতন্ত্র ত্বরীক্বা প্রতিষ্ঠা করেন, অনুরূপ হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাঞ্জারীও (রাহি.) পূর্বাধারাবাহিকতায় সুহরওয়াদী-ক্বাদেদী হওয়া সত্ত্বেও স্বতন্ত্র একটি ত্বরীক্বা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

(২) তাসাওউফের জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই অবগত যে, কোন শহর, দেশ বা অঞ্চলের কুতুবের পদবী 'কুতুবুল আকুতাব' নয়; বরং সমগ্র সৃষ্টি জগতের কুতুব 'কুতুব' আলম' কেই কুতুবুল আকুতাব বলা হয়। আর 'কুতুবুল আকুতাবে বেনাদে মাশারিকু' অর্থ 'পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী 'কুতুবুল আকুতাব'ই হবে; পূর্বাঞ্চলের কুতুবুল আকুতাব আদৌ নয়! কেননা 'বেনাদ' অর্থে শহর-নগর-গ্রামাঞ্চল তথা এককথায় অঞ্চলই বুঝায় (কিশাওয়ায়ী); এবং মাশারিকু অর্থ যে, 'পূর্ব' তা ভাষাজ্ঞানী মাত্রই অবগত; আর এতদাঞ্চল সম্পৃক্ততায় ব্যক্তি-সত্তার পরিচিতি জ্ঞাপনীয় 'ইয়া' বা 'ইয়ায়ে নিস্বাতী'র অর্থ অধিবাসীই তো হয়। যেমন গাউসে বাগদাদী বলতে বাগদাদ শহরের গাউস না বুঝিয়ে বাগদাদের অধিবাসী গাউস বুঝায় এবং 'রাসুলে আরবী' বলতে আরব দেশের জন্যই মাত্র রাসুল না বুঝিয়ে 'আরবের অধিবাসী' (সমগ্র জগতের) রাসুল বুঝায়; তদ্রূপ 'কুতুবুল আকুতাবে বেনাদে মাশারিকু' বলতেও পূর্বাঞ্চলের কুতুবুল আকুতাব না বুঝিয়ে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী (সমগ্র জগতের) কুতুবুল আকুতাব' বুঝানোই বিধেয়।

(৬ষ্ঠ পঙ্ক্তি)- “ওই মাইজভাণ্ডার শরীফের অধিবাসী রাজাধিরাজ গাউসুল আ'যমই; তিনি হযরত আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে সম্পর্কিত উম্মতগণের আলোকবর্তিকা।”

টীকা: যারা হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাঃ) কে হযরত শেরে বাংলা (রহ.)'র বরাত দিয়ে 'পূর্বাঞ্চলের জন্যই গাউসুল আ'যম' আখ্যা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে, তাদের বিপক্ষে এখানে স্পষ্ট অভিমত প্রতিভাত হয় যে, 'হযরত আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে সম্পর্কিত উম্মতগণের আলোক বর্তিকা' মর্মেও তিনি সমগ্র জগতের গাউসুল আ'যম।

(৭ম পঙ্ক্তি)- “তঁার ছায়া, 'হুমা' (যার ছায়াতলে এলে ঐশ্বর্য ও রাজত্ব পাওয়া যায়, এমন) পাখির ছায়া স্বরূপ জানাবে। জগতকূলে তিনি হন, (যদ্বারা পরশমণি তৈরী হয় এমন) লাল গন্ধক বা পরশমণির মূল।”

টীকা: হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাঃ) 'র ছায়াতলে এসে ঐশ্বর্য-রাজত্ব লাভের বিষয় সর্বজন বিদিত বাস্তবতা। আর বাস্তবিকই তিনি উল্লেখিতরূপ লাল গন্ধক বা পরশমণির মূল হন বিধায় তাঁর সান্নিধ্যে ও তুরীকায় পরশমণিভুল্য আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন বহু ওলীমুল্লাহ সৃষ্টি হওয়ার ধারা অব্যাহত।

(৮ম পঙ্ক্তি)- “পয়গাম্বরকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র হাতে (পরস্পর সমাক্ষ ৩ স্বতন্ত্র অনধিক দুই গাউসুল আ'যমের জন্য) দু'টি

তাজ বা মুকুট ছিলো; তম্ভাধ্যকার একটি নিঃসন্দেহে হযরত শাহ আহমদুল্লাহ (রাঃ) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আনহু'র শির মূবারকে স্থাপিত।”

টীকা: দু'টি তাজ বা মুকুট মর্মে ক্ষমতা ও মর্যাদায় বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের সমাধিকারী দু'ভাবধারার অনধিক দুই স্বতন্ত্র গাউসুল আ'যমের বিশেষত্ব প্রতিভাত হয়। যা হযরত গাউসুল আ'যম দ্বয়ের প্রথমজন ইঙ্গিতে এবং দ্বিতীয়জন খোলাখুলিই ঘোষণা করেন। যথা - প্রথমজনের ইরশাদ সূত্রে নিজ সমাক্ষ একজন বন্ধুর কথা এমন বৈশিষ্ট্য সহকারে উল্লেখ করেন, যাতে নিজের এবং হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাঃ) 'র উক্তরূপ অনন্য বিশেষত্ব প্রতিভাত হয়। (বাহজাতুল আসার, বৈরুত, লেবানন: ৫৫ পৃষ্ঠার বিবৃতি মর্মে)। আর অনন্য অপর গাউসুল আ'যমের ইরশাদ হচ্ছে- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হস্ত মূবারকে দু'টি তাজ বর্ণনান্তরে টুপী ছিল; একটি আমার মাথায় পরিয়ে দেন, অপরটি আমার ভাই পীরান পীর শাযখ আব্দুল কাদের জীলানী সাহেবের মাথায় পরানো হয়। (জীবনী ও কেরামত গ্রন্থ, বেলায়তে মোতলাকা সহ বহুল তথ্য সূত্রে বর্ণিত)।

অতএব সর্বজনীন স্বীকৃত এ মহান দুই গাউসুল আ'যমের ঐকমত্য ভিত্তিক অভিমতের সাথে সাংঘর্ষিক মতভিন্নতা তথা গাউসুল আ'যমের সংখ্যা দু'য়ের কম কিংবা বেশী বলা হয় এমন মতভিন্নতা মাত্রই পরিত্যাজ্য।

এখানে উল্লেখিত 'তাজ' প্রদত্ত হওয়ার বিষয়টি যে, গাউসুল আ'যমিম্যত ও গাউসুল আ'যমের সংখ্যা নিদিষ্টকরণ মর্মীয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, তা পরবর্তী পঙ্ক্তি যোগে আরো সুস্পষ্ট।

(৯ম পঙ্ক্তি)- “এই (তাজ-শিরোপা প্রদত্ত হওয়ার) কারণেই তিনি (অনন্য দু'য়ের এক স্বতন্ত্র) গাউসুল আ'যম। পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত তাঁর রওয়াহ শরীফ থেকে জিন-পরী ও মানবজাতি ফয়য-অনুগ্রহের দান লাভকারী হয় (বিধায় তিনি গাউসুল আ'যম; গাউসুল সাক্বাঈন)।”

টীকা: (১) এখানে গ্রন্থকার মহোদয়ের ভাষায়- “যী-সবব উ-গাউসুল আ'যম” অর্থাৎ 'এ (তাজ-শিরোপা প্রদত্ত হওয়ার) কারণেই তিনি (অনন্য দু'য়ের এক স্বতন্ত্র) গাউসুল আ'যম কথাটি পরিপূর্ণ একটি বাক্যই বটে। এটির সাথে পরবর্তী বাক্যের একটি অংশ তথা 'দর বেনা-দে মাশারিকু-', অর্থাৎ 'পূর্বাঞ্চল-এ' কথাটি বিধিবাহিত্ত ভাবে যুক্ত করার প্রয়াসে যারা 'দর' শব্দের অর্থ '-এ' বা 'মধ্যে' না করতঃ 'জন্য' করে থাকে, তারা চোরাবালির অমে নির্ঘাত নিমজ্জিত বৈকি।

পক্ষান্তরে 'দর বেনা-দে মাশারিকু-' (পূর্বাঞ্চল-এ) বাক্যাংশটি তাঁর রওয়াহ'র

অবস্থান নির্দেশকরণাত্মকই এবং এটির সংযুক্তি পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে নয়, বরং পরবর্তী বাক্যের অন্তর্গত 'রওয়াহ আশ' (তাঁর রওয়াহ) বাক্যাংশের সাথেই। আর 'বেলা-দে মাশুরিকী'-র অর্থ এখানকার ক্ষেত্রানুসারে 'পূর্বাঞ্চল'ই হবে; যেমনটি স্বাধীনতা পূর্বকালে 'মাশুরিকী-পাকিস্তান'-র বা 'পাকিস্তান-দে মাশুরিকী'-র অর্থ 'পূর্ব পাকিস্তান' বুঝানো হত। কারণ ব্যক্তি সত্তা বিহীন কেবলমাত্র স্থানের সাথে সম্পৃক্ততা জ্ঞাপনীয় 'ইয়া' যুক্ত হলে এমন অর্থই বিধেয়।

আর 'জিন-পরী ও মানবজাতি ফয়-অনুগ্রহের দান লাভকারী হয়' উক্তি মর্মে প্রতিভাত হয় যে, হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাহি.) অবিকল হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী-বাগদাদী (রাহি.)'র মতো গাউসুল সাক্বালাঈন'ও হন। অতএব সর্বসাক্বাল্যে আমাদের উপরোক্তরূপ অনুবাদই যথার্থ।

(২) এতে করে যে দু'টি তাজ-শিরোপা প্রদত্ত হওয়ার কারণে অধিক দুই গাউসুল আ'যম সত্য হন, তদ্ব্যতীত অন্য কাউকে গাউসুল আ'যম বলতে গেলে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক! তাহলে সযং হযরত শেরে বাংলা (রহ.)ও এ দু'সত্তা ব্যতীত অন্যান্যদেরকে 'গাউসুল আ'যম' লিখার কারণ কী?

অতএব কারণ খুঁজে সময় করতে গেলে আমাদের বোধবুদ্ধিতে যেটুকু আয়ত্রে আসে তা নিম্নরূপ।

ক. হযরত কুতুবুল আকুতাব বাবা ভাণ্ডারী (রাহি.)কে তিনি 'ছানী' বা দ্বিতীয় গাউসুল আ'যম বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ ছানী বা দ্বিতীয় কথাটি পরিভাষায় রূপক অর্থানুসারে- 'প্রকৃত গাউসুল আ'যম নন, বরং গাউসুল আ'যমের মতো' বুঝানো হয়। যেমন- ছানী ইউছুপ, ছানী ওয়াইস কুরগী ইত্যাদির অনুরূপ অর্থই বুঝানো হয়। অন্যথায় অধিক দুই গাউসুল আ'যমের পরবর্তী সময়কালীন হযরত বাবা ভাণ্ডারী (রাহি.) কে প্রকৃত অর্থে দ্বিতীয় বলার কোন অবকাশ নেই। এমনকি প্রকৃত অর্থে 'মাইজভাণ্ডার শরীফের দ্বিতীয়' বলে আখ্যা প্রদান করতে গেলেও দু'টি অসঙ্গতি দেখা দেয়। একেতঃ 'তাজ-শিরোপা প্রদত্ত হওয়ার কারণে গাউসুল আ'যম সত্য হন' মর্মের সাথে সময় হয়না; দ্বিতীয়তঃ বাগদাদের অধিবাসী দুইজনকে গাউসুল আ'যম লিখার ক্ষেত্রে তিনি তদীয় মুরশিদ ক্বিবলাকে দ্বিতীয় গাউসুল আ'যম বলেননি বিধায় এখানেও আবাসস্থল ভিত্তিক প্রকৃত অর্থে দ্বিতীয় বলার সূত্র প্রশ্নাতীত নয়।

খ. হযরত শেরে বাংলা (রহ.) কর্তৃক আপন মুরশিদ ক্বিবলাকে গাউসুল আ'যম লিখাটা একান্ত ব্যক্তিগতের পর্যায়ভুক্ত বিষয়; যা সার্বজনীন বিষয় আদৌ নয়। সার্বজনীন ভাবে বললে তো সর্বস্তরের সূরী জনতার মুখে মুখেও তা ধ্বনিত

হওয়া পরিলক্ষিত হতো! অথচ তাঁর মুরশিদ ক্বিবলাকে অদ্যাবধি তিনি ব্যতীত যেমন কাউকে গাউসুল আ'যম বলতে দেখা যায় না! এতেন ব্যক্তিগতের পর্যায়ভুক্ত বিষয় সম্পর্কে অন্ততঃ তাসাওউফ-তুরীকৃত চর্চাকরীগণ সম্যক অবগত আছেন যে, আপন আপন মুরশিদের রূপের আয়নায় খোদা-রাসুলের গুণরূপও দর্শন মিলে! এমর্মে আল্লামা আরেক রমী (রহ.) বলেন- "তুমি যখন পীরের সত্তাকে গ্রহণ করলে, খোদার আগমনও সে সত্তায় নিহিত, রাসুলেরও।" অতএব আপন মুরশিদের রূপদপর্পে গাউসুল আ'যম দর্শন হেন ব্যক্তিগতের পর্যায়ভুক্ত বিষয় আদৌ সার্বজনীনও নয় এবং সার্বজনীন বিষয়ের সাথে বিরোধপূর্ণও নয়।

উল্লেখ যে, হযরত শেরে বাংলা (রহ.) এর প্রধান খলীফা হযরত শাহসুফী মাওলানা আব্দুল মা'বুদ আল ক্বাদেরী (রহ.) কর্তৃক হযরত শেরে বাংলা (রহ.) কে যুগের গাউসুল আ'যম লিখা প্রভৃতিও উক্ত একইরূপ ব্যক্তিগতের পর্যায়ভুক্ত বিষয়। এসব ব্যক্তিগতের পর্যায়ভুক্ত বিষয় সার্বজনীনের সাথে তখনই বিরোধপূর্ণ হয়, যখন অপর কাউকেও তা মানতে বাধ্য করার মতো বক্তব্য কিংবা আচার-আচরণ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। আর এ সব ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পায়নি বিধায় সার্বজনীন বিষয়ের সাথে বিরোধপূর্ণ বলারও কোন অবকাশ নেই।

গ. হযরত শেরে বাংলা (রহ.)'র ভাষ্য মোতাবেক- "পরীতান রাজ্যের রুকুম শহরের বাসিন্দা (স্বজাতীয়) শাহানশাহ বক্তানুস জিনদের মধ্যে গাউসুল আ'যম।" এক্ষেত্রে বলা যায়- এটি মানবজাতির সাধারণ বোধবুদ্ধির আয়তুর বাইরে, মানবজাতি থেকে ভিন্ন একটি জাতিরই বিষয়। অতএব তা' মানবজাতির বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় বিধায় বিরোধপূর্ণ হওয়ার বিষয়ও নয়।

(৩) কেউ যদি পদ-পদবী আর ক্ষমতা ও মর্যাদাগত খেতাব-অভিধা-উপাধির তারতম্য বুঝতে ব্যর্থ হয়ে গাউসুল আ'যমিয়তকে বেলায়তের সর্বোচ্চ পদ কল্পনা করতঃ অভ্যেক ধারণায় গাউসুল আ'যমের সংখ্যা দু'য়ের বেশী বলে জ্ঞান করে থাকে, তজ্জন্য এখানে চিন্তার বিষয় রয়েছে। আর তা'হল- গাউসুল আ'যমিয়তের তাজ-শিরোপা, যা (বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রদত্ত হওয়ার প্রতীক স্বরূপ) গাউসুল আ'যমের শির মূবারকে স্থাপিত ও সংরক্ষিত; তা' বেলায়তের কোন পদ বা মনদ বলি বিবেকসম্পন্ন কেউ ভাবতেও পারে কী! কোথায় শির মূবারকে স্থাপিত গাউসুল আ'যমিয়তের প্রতীক তাজ-শিরোপার সুমহান মর্যাদা; আর কোথায় অধিষ্ঠান-আরোহণ-উপবেশনের মননদের অবস্থান!। হায়রে বিবেকের বিপর্যয়!

হে বিবেক! গাউসুল আ'যমের শির মূবারকে স্থাপিত ও সংরক্ষিত তাজ-

শিরোপাই হচ্ছে গাউসুল আ'যমিমতের প্রতীক; যা ই হ জগত থেকে পদী করা অবস্থায়ও তাঁর শির মূবারকে সংরক্ষিত থাকে। আর গাউসুল আ'যম যে মূবারক মসনদে ইতঃপূর্বে সমাসীন ছিলেন, সে মূবারক মসনদ বা পদের নাম হচ্ছে- গাউসিয়ত বা কুতুবিয়ত; সেখানেই মাত্র অপরজনের অভিষেক ঘটানো হয়।

(১০ম পঙ্খক্তি)- “অপর মুকুটি এই শাহ জীলানী রাখিয়ান্নাহ তা'আলা আনহুর শির মূবারকে রক্ষণাবস্থায় রয়েছে (বিধায় অনন্য দু'য়ের অপর স্বতন্ত্র গাউসুল আ'যম তিনিই)। এই কারণেই (শীয় যুগের তথা হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর যুগ পূর্ববর্তী) সকল ওলীর ঘাড় মূবারকে তাঁর চরণ মূবারক রক্ষিত।”

টীকা: তাঁর চরণ মূবারক প্রতিটি ওলীর ঘাড় মূবারকে রক্ষিত বলে উল্লেখিত উক্তির মর্ম কী? মূলতঃ এ মর্মীয় উক্তি স্বয়ং হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী রাখিয়ান্নাহ আনহু কর্তৃকই বিধোষিত এবং শীয় যুগের সকল ওলীর জন্যই প্রযোজ্য বলে স্বয়ং তৎ কর্তৃক স্বীকৃত। যেমন- বাহজাতুল আসরার (বৈরত, লেবনান প্রকাশিত) গ্রন্থের ১৩-২০ পৃষ্ঠা জুড়ে সন্নিবেশিত তৎপূর্বতন ৭ জন মহামান্য ও সুপ্রসিদ্ধ ওলীযুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী থেকে উক্তরূপ যুগের সাথে নিদর্শিত ও শর্তযুক্ত হওয়া সাব্যস্ত হয়-তো বটেই; উপরন্তু তদাধ্যে ওই সময়কার গাউসের ভবিষ্যদ্বাণীর মর্মানুসারে তা স্বয়ং হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী (রা.দ্বি.) কর্তৃক স্বীকৃত অভিমত বলেই সাব্যস্ত। কেননা এতে ভাবী গাউসুল আ'যম তদানীন্তন মূবক শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী (রা.দ্বি.) কে সন্মোদন করতঃ তিনি বলেন- “আমি এক্ষণ দেখতে পাচ্ছি যে, আপনি পূর্ণসমাবেশে কুরসীতে আরোহণ পূর্বক বলতে যাচ্ছেন, ‘আমার এ চরণ সকল ওলীর ঘাড়ের উপর রয়েছে।’ আর আপনার সময়কার ওলীগণকে এক্ষণ দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা আপনার মর্ফাদার কারণে তাঁদের ঘাড়সমূহ ঝুঁকিয়ে দিতে যাচ্ছেন” (প্রাণ্ডক্ত, ১৯ পৃষ্ঠা)। অতএব বিষয়টি শীয় যুগের সাথে নিদর্শিত ও শর্তযুক্ত হওয়াটা স্বয়ং তৎ কর্তৃক স্বীকৃত বলেই সাব্যস্ত। আর উক্ত গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় বিবৃত ‘পরস্পর সমকক্ষ বন্ধু বলে আখ্যায়িত করতঃ বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনার মর্মানুসারে- তাঁর যুগবৃত্ত হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.দ্বি.)’র যুগপূর্ববর্তী সময়কাল পর্যন্তই সুবিস্তৃত (বিস্তারিত জানার জন্য ‘গাউসুল আ'যম অভিধা’ দ্রষ্টব্য)।

(১১শ পঙ্খক্তি)- ‘মিরাজের রাতে মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মূবারক ঘাড়ে পবিত্র চরণ রেখে সুউচ্চ আরশে যান; সেটাই তাঁর রক্ষক।’

(১২শ পঙ্খক্তি)- ওই মুহূর্তযোগে মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা

অতি সুন্দরই বললেন, তুমি হলে মুহীউদ্দীন (দ্বিনের পুনর্জীবিতকারী): এটাকে তোমার এ ষিদ্দমতের উপহার জেলে রাখো।

(১৩শ পঙ্খক্তি)- আমি ক্বাদেরী, ওই গাউসুল আ'যমের স্নোগানই দিচ্ছি: কুতুবে আলম শাহ আহমদুল্লাহ রাখিয়ান্নাহ আনহুর কথাই আমি বলছি।

টীকা: ‘দুই তাজ’ - এর বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথমে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.দ্বি.) সম্পৃক্ত এবং পরে হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী (রা.দ্বি.) সম্পৃক্ত বর্ণনা ইতোপূর্বে শেষ হয়েছে। অতঃপর এ পঙ্খক্তির মাধ্যমে ‘এই গাউসুল আ'যম’ না বলে ‘ওই গাউসুল আ'যম’ বলা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এখানে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.দ্বি.)’র স্নোগানই দেয়ার কথা বলা হয়; যা দ্বিতীয়ার্ধে নাম উল্লেখ করতঃ আরো অতি সুস্পষ্ট করে তোলা হয়। এতে করে এ পঙ্খক্তির মর্ম দাঁড়াল - “আমি ক্বাদেরী হওয়া সত্ত্বেও ওই গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর স্নোগানই দিচ্ছি; কুতুবে আলম শাহ আহমদুল্লাহ (রা.দ্বি.)’র কথাই এখানে আমি বলছি।” অতএব এতদাঞ্চলের ক্বাদেরী ত্বরীকার নিষ্ঠাবান অনুসারীদের জন্য এখানে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, তাঁদের স্নোগানও ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত শেরে বাংলা (র.হ.)’র অনুরূপ হওয়ার দাবী রাখে।

(১৪শ পঙ্খক্তি)- “হযরত আহমদুল্লাহ গাউসুল আ'যম (রাখিয়ান্নাহ তা'আলা আনহু)’র জন্য অনেক হাজার প্রশংসাবাদই হল আমার মুখের ওয়ীফা বা নিত্যপাঠ।”

টীকা: ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত শেরে বাংলা আল ক্বাদেরী (র.হ.)’র প্রতি শ্রদ্ধাশীল নিষ্ঠাবান সূরি কিংবা ক্বাদেরীগণের মুখের ওয়ীফা বা নিত্যপাঠও একইরূপ হওয়ার দাবী রাখে।

(১৫শ পঙ্খক্তি)- কুতুবে মাশরিকী (পূর্বের অধিবাসী কুতুব) উপনামে তিনি জগত প্রসিদ্ধ, তাঁর (সমগ্র সৃষ্টিজগত ব্যাপী কুতুবীয়ত ও গাউসুল আ'যমীয়ত সত্তা থেকে) ফয়য-অনুগ্রাহের দানে সৃষ্টি জগতের সমূহ প্রান্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।”

টীকা: তাঁর ফয়য অনুগ্রাহের দানে সৃষ্টি জগতের সমূহ প্রান্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে মর্মীয় উক্তি দ্বারাও প্রতিভাত হয় যে, তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্যই গাউসুল আ'যম।

(১৬শ পঙ্খক্তি)- “তাঁর কারামাত সমূহ গণনার সীমার বাইরে। অর্পণ অনেকই তাঁর ফয়য-অনুগ্রাহের দান দৌলতে সর্বাঙ্গাক পরিপূর্ণ হয়েছে।”

(১৭শ পঙ্খক্তি)- “মাইজভাণ্ডার শরীফ তাঁর আরামস্থলে (রওয়াহ শরীফ) পরিণত

হয়েছে। (আমি) আযীযুল হকু তাঁর জন্য মনোপ্রাণে উৎসর্গিত।”

(১৮শ পঙ্খক্তি)- “তাঁর আরাযমুল (মাযার শরীফ) ঈসা পুর পরগনার অস্তর্ভুক্ত। (আমি) আযীযুল হকু তাঁর জন্য মনোপ্রাণে উৎসর্গিত।”

(১৯শ পঙ্খক্তি)- “হে খোদা! হযরত গাউসুল আ'যম (রাখিয়াল্লাহু আনহু) 'র ওসীলায়, তাঁর আযীযকে গাউসুল আ'যমে বিলীন করে দিন।”

টীকা: এখানে ‘গাউসুল আ'যমে বিলীন করে দিন’ অনুবাদের পরিবর্তে কেউ কেউ ‘গাউসুল আ'যম করে দিন’ মর্মে অন্যায় অনুবাদ করে থাকে। তাদের উক্ত অনুবাদের অন্যায়তা প্রমাণিত হয়, আভিধানিক অর্থেও; ভাবার্থেও। কেননা ‘গাউসুল আ'যম’ শব্দটির ক্রিয়ামূল ‘গাউস-নী-দন’ -এর আভিধানিক অর্থ- জড়ানো, ফিরানো (কিশ্‌ওয়াবী)। আর ভাবার্থে ‘গাউসুল আ'যম করে দিন’ মর্মীয় অনুবাদ অসম্ভবই। কারণ ইতিপূর্বে ‘দু'টি ভাঙ্গ’ মর্মে সুনির্দিষ্ট অনধিক দুই গাউসুল আ'যম ব্যতীত অপর কাউকে গাউসুল আ'যম করে দেওয়ার আবেদন, পূর্বস্বীকৃত অভিমতের পরিপন্থী বিধায় উক্তরূপ মর্মীয় অনুবাদ সম্ভবই নয়।

পক্ষান্তরে বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থের অনুরূপ- ‘গাউসুল আ'যমে বিলীন করে দিন’ অনুবাদই এখানে যথার্থ হয়; এটা একদিকে যেমন আভিধানিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তেমনি ভাবাধিসহ উক্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অভিমতের ভিত্তিতে গ্রন্থকার মহোদয় কর্তৃক স্বীকৃতও বটে।

(২০শ পঙ্খক্তি)- “আযীযুল হকু কর্তৃক বর্ণিত এ পঙ্খক্তিগুলো যেন, তার (আমি) আযীযুল হকের) পরকালের মুক্তির কারণে পরিগণিত হয়।”

টীকা: হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাখিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা তুলে ধরাকে ইমামে আহলে সুন্নাত গাযীয়ে রাখিয়াল্লাহু আনহুমা শেরে বাংলা (রহ.) রাখিরাভের নাজাতের উসীলাহ বলেই বিশ্বাস করতেন। তাঁর এহেন বিশ্বাসের সুফল পাওয়ার সম্ভাবনাও অমূলক নয়। কারণ, মাইজভাণ্ডারী তুরীকার অনুসারী অনেকেই লামা মুবারক দাফনের বহুকাল পরও কবরে অবিস্থ আরবি স্কৃত হওয়ার অনেক ঘটনাই তো এ জনপদের অসংখ্য লোকের জানা; যা পরকালে মুক্তির এক জ্বলন্ত নিদর্শন।

পক্ষান্তরে যারা শানে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাখিয়াল্লাহু আনহুকে বিকৃত করে তুলে ধরার অপচেষ্টায় লিপ্ত, তারা নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনছে মাত্র।

(২১শ পঙ্খক্তি)- “হে খোদা! গাউসুল আ'যমের ওসীলায় তাঁর আযীযকে উভয়

জগতের সম্মান-মর্যাদা দান করুন।”

টীকা: কায়মানোবাকো তাঁর এ প্রার্থনা কি বৃথা গিয়েছে? কখনো নয়, ইহজগতে তিনি অনুপম সম্মান-মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার বিষয় সর্বজন অবগত। আর উম্মতে মুহাম্মাদী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাক্ষ্য বিষয়ক কুরআন-সুন্নাহ দলিলালোকে পরজগতের যথার্থ সম্মান-মর্যাদাও সুপ্রমাণিত।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, গাউসুল আ'যমের প্রতি ঈসালে সওয়ার যোগে নয়, বরং হযরত গাউসুল আ'যমের ওসীলাহ যোগে প্রার্থনা করার শিক্ষাও এখানে রয়েছে।

‘দিওয়ান-ই আযীয’ সংশ্লিষ্ট বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতঃ হযরত শেরে বাংলা (রহ.) 'র জীবনী গ্রন্থ আলোচ্য অবলোকন করা যাক। সুন্নিয়তের সুবিশাল ষিদ্দমাত আঞ্জাম দানে সাড়া জাগানো সফল সিপাহসালার ইমামে আহলে সুন্নাত গাযীয়ে রাখিয়াল্লাহু হযরতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ আযীযুল হক শেরে বাংলা আল ক্বাদেয়ী (রহ.) 'র অবিস্মরণীয় সাফল্যের কথা বিনিষ্টজন থেকে সর্ব সাধারণ সকলেরই জানা বিষয়। কিন্তু উক্ত সাফল্যের উৎসমূল বা রহস্যপূর্ণ হাক্কিকত অনেকরই অজানা, কিংবা জানা সত্ত্বেও যথার্থরূপে উপলব্ধি করতে খুব কম সংখ্যকই সক্ষম। অথচ ঘটনাক্রমে সে উৎসমূলের কথা, তিনি নিজেরই সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন।

তাঁর জীবনী গ্রন্থ- রচনায়: ডা. সৈয়দ সফিউল আলম, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৯৬ ইংরেজী, ১৩৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে- “হযরত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহ.) এর সর্বাধিক সংস্পর্শপ্রাপ্ত মাওলানা মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাংহেব এই ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত শেরে বাংলা (রহ.) একবার ওয়াজ মাহফিল উপলক্ষে ফটিকছড়ি থানার অস্তর্গত নানুপুর গ্রামে আগমন করেছিলেন। মাহফিল শেষে তিনি গাড়িতে করে বাড়ী অভিমুখে ফিরছিলেন। আমি অধম ছাত্রের সফরসঙ্গী হিসাবে গাড়িতে ছিলাম, গাড়ি যখন ফটিকছড়ি রোড ধরে মাইজভাণ্ডার শরীফ অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছিল, হঠাৎ ঘটনাক্রমে আমরা পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটি উজ্জ্বল আলোকরশ্মি আমাদের গাড়িকে অনুসরণ করছে। এরূপ তেজোদীপ্ত আলোকছটা দর্শন করে আমরা সকলে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। হজুরকে তার রহস্য ও হাক্কিকত জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর করলেন, ‘এটা গাউসুল আ'যম হযরত কেননা (রা.) এর পক্ষ থেকে আমি অধমের প্রতি বিশেষ নজর করম ও রহমত। যা সর্বদা আমাকে আবেষ্টন করে ও বিপদমুক্ত রাখে।’ নাজিরহাট পৌঁছা অবধি আমরা এই আলোকরশ্মি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। অতঃপর এই আলোকছটা অদৃশ্য হয়ে যায়।”

ঘটনা প্রবাহে উক্ত তেজেদীপ্ত আলোকছটা কিছুসময়ের জন্য পূর্ণ্যমান হয়ে অদৃশ্য হলেও সে অদৃশ্য শক্তিই যে, ইমামে আহলে সুন্নাত গাযীয়ে দ্বীনোমিল্লাত আল্লামা শেরে বাংলা (রহ.)'র অবিস্মরণীয় সাফল্যের অন্তরানে সার্বক্ষণিকের মূল উৎস, তা এখানে সুস্পষ্ট। গাউসুল আ'যম হযরত কেবলা (রাঃ), 'র বিশেষ নজর করম ও রহমতই হচ্ছে সে অদৃশ্য শক্তি, যা গাযীয়ে মিল্লাত আল্লামা শেরে বাংলা (রহ.) কে সর্বদা আবেষ্টন করে ও বিপদমুক্ত রাখে। অতএব গাযীয়ে দ্বীনোমিল্লাত আল্লামা শেরে বাংলা (রহ.)'র অবিস্মরণীয় সাফল্যের উৎসমূল হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁরই অভিজ্ঞি আরেকবার স্মরণ করি-“এটা গাউসুল আ'যম হযরত কেবলা (রা.) এর পক্ষ থেকে আমি অধর্মের প্রতি বিশেষ নজর করম ও রহমত যা সর্বদা আমাকে আবেষ্টন করে ও বিপদমুক্ত রাখে।”

উক্ত জীবনী গ্রন্থের ১২২-১২৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী ‘আউলিয়ায়ে কেবাম-এর রূহানী কনফারেন্স’ শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখ আছে- “হযরত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহ.) শহরের কাজীর দেউড়ীস্থ বাসভবনে একাদিক্রমে প্রায় ত্রিশ বৎসর অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি তার সন্নিকটস্থ জামাল খাঁন লেইন বাসভবনে পরবর্তী পাঁচ বৎসর কাটান। এই দুই বাসভবনে অবস্থানকালীন তাঁর মহান আধ্যাত্মিক জীবনের অন্যতম রহস্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে আউলিয়ায়ে কেবাম এর রূহানী কনফারেন্সের আয়োজন। প্রতি বুধবার দিবাগত রাতে আউলিয়ায়ে কেবামের এই মহান আধ্যাত্মিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। এই নূরানী কনফারেন্সে দুনিয়া থেকে বেছাল প্রাপ্ত সম্মানিত মহান আউলিয়ায়ে কেবামের রূহ হাজির হতেন এবং বিভিন্ন জটিল বিষয়ে তাঁদের সাথে সরাসরি কথোপকথন হত। হুজুরের ফয়েজপ্রাপ্ত অন্যতম একনিষ্ঠ মুরিদ ও হাটহাজরী দরবার শরীফের বর্তমান খাদেম বয়োবৃদ্ধ জনাব আলহাজ্ব এজলাশ মিয়া আল কাদেরী উক্ত কনফারেন্সের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি হুজুরের শহরের বাসভবনে উক্ত কনফারেন্সে প্রায় সময় উপস্থিত থাকতেন। তিনিই আমাদেরকে এই বর্ণনাসমূহ প্রদান করেন। হযরত শেরে বাংলা (রহ.) এর উক্ত দিন কোন মাহফিল থাকলেও তিনি ঐ দিন রাতি এগারটার পূর্বেই বাসভবনে ফিরে আসতেন। বুধবার রাতি এগারটার পর এই নূরানী কনফারেন্সের মাহফিল শুরু হত এবং গভীর রাত পর্যন্ত এই কনফারেন্স বিরতিহীনভাবে চলত। এই সম্মেলনে হুজুরের অনেক সম্মানিত মুরিদান ও বহু ভক্তবৃন্দ উপস্থিত থাকতেন। বিশেষতঃ হুজুরের প্রধান খলিফা খিতাপটর বেদুয়া নিবাসী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মাবুদ আল কাদেরী (রহ.) প্রায় সময় হাজির থাকতেন। তাছাড়া হুজুরের অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা জামাল উদ্দিন আল কাদেরী (রহ.)ও মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতেন। ‘দিওয়ানে আজীজ’ থেকে নির্ধারিত আউলিয়ায়ে

কিরামের শানে কুছিদা পাঠ করা হত। যাঁর শানে কুছিদা পাঠ করা হত তিনিই রূহানীভাবে হাজির হতেন। প্রায় প্রতিটি কনফারেন্সে ছদরত করতেন গাউসুল আজম হযরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ আল কাদেরী মাইজভাণ্ডারী (রা:)। তাছাড়া বেশীরভাগ সময়ে যাঁরা উপস্থিত হতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রহ:), সুলতানুল বাংলা হযরত শাহ জালাল (রহ:), পানিপথের হযরত শাহ বু-আলী কলন্দর (রহ:), কুতুবুল আকতার হযরত শাহ আমানত (রহ:) সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহ:), হযরত শাহ মোহছন আউলিয়া (রহ:) প্রমুখ সুবিখ্যাত আউলিয়ায়ে কেবাম। মোট কথা দিওয়ানে আজীজে যে সকল বেছাল প্রাপ্ত আউলিয়ায়ে কেবামের নাম ও শান বর্ণনা করা হয়েছে তাঁরা পূর্বনির্ধারিত যোগসূত্র ও কর্মসূচী অনুযায়ী তশরীফ আনতেন।

তাছাড়া কোন কোন সময় বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ রাহমাতুল্লিল আলমীন পেয়ারা রাসূল (দ:) তশরীফ আনতেন। তখন পরিবেশ খুবই জলানিয়তময় ও নিস্তক থাকত। মেশকে আষরের সুম্মাণে পরিবেশ সুগন্ধময় হয়ে উঠত।”

উক্ত জীবনী গ্রন্থের ১২৭ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান- “আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহ:) প্রায়শঃ বলতেন, ‘মাইজভাণ্ডার শরীফ গেলে অলী হওয়া যায়’।”

উপরোক্ত তথ্যাবলীর মধ্যে তত্ত্বগত কিছু চিন্তার বিষয় রয়েছে। সাধারণত আমরা জানি যে, প্রতি যুগে বিদ্যমান ও৫৬ জন ওলীমুল্লাহর মাধ্যমে সৃষ্টিজগত পরিচালিত হয়। তাহলে দুনিয়া থেকে বেছাল প্রাপ্ত মহান আউলিয়ায়ে কিরামের এহেন বিশেষ আধ্যাত্মিক কনফারেন্সের মর্ম কি হতে পারে?

উত্তর তথ্য সূত্রেই দেয়া আছে। যেমন তথ্যে প্রকাশ- ‘বিভিন্ন জটিল বিষয়ে তাঁদের সাথে সরাসরি কথোপকথন হত।’ এখানে জটিল বিষয় বলতে এমনই জটিল বুখা যাচ্ছে যে, তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়া যুগস্থ ওলীগণের এমনকি তাঁদের প্রধান গাউসে যমান বা কুতুবুল আক্বতাবে যমানেরও ক্ষমতার বাইরে এবং তা গাউসুল আ'যম কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামারই ক্ষমতার আওতাধীন। তাই তথ্যে প্রকাশ “প্রায় প্রতিটি কনফারেন্সে ছদরত (সভাপতিত্ব) করতেন গাউসুল আ'যম হযরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ আল কাদেরী মাইজভাণ্ডারী (রা:)।” আরো প্রকাশ- “কোন কোন সময় বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ রাহমাতুল্লিল আলমীন পেয়ারা রাসূল (দ:) তশরীফ আনতেন।”

এখানে প্রায় প্রতিটি কনফারেন্সে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাঃ) 'র ছদরত- সভাপতিত্বের মর্ম ও গুরুত্ব চিন্তা করলে প্রতিভাত হয় যে, এটা তাঁরই

গাউসুল আ'যমিয়তের নিয়ন্ত্রণাধীন যুগবৃত্ত। আর এ যুগ বৃত্তের সূচনার মাধ্যমে হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী (রাঃ) 'র যুগবৃত্ত সমাপ্ত হয়েছেন বিধায় উক্ত কনফারেন্স সমূহে তাঁর তশরীফ আনয়নের প্রয়োজন পড়েনি। এতে আরো প্রতিভাত হয় যে, এক গাউসুল আ'যম অপর গাউসুল আ'যমের মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও নেই এবং একের নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে অপরের হস্তক্ষেপও নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়টি বাহজাতুল আসরার ৫৫ পৃষ্ঠাস্থ বর্ণনা মর্মে আরো সুস্পষ্ট যে, 'গাউসুল আ'যমকে তদীয় যমানাবাসীর সমুদয় কার্যবলীর নিয়ন্ত্রণ সোপর্দ করা হয় এবং তাদের থেকে যাকে ইচ্ছা স্বাধিকারে দান করার ও বঞ্চিত করার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়।' আর মাইজভাণ্ডার শরীফ গেলে অলী হওয়া যায়' উক্তি মর্মেও বেলায়তের দস্তুর বন্টনে গাউসুল আ'যমের স্বাধীন ক্ষমতার বিষয় সুস্পষ্ট। পরন্তু এ উক্তির আরো ব্যাখ্যা অচিরেই প্রদত্ত হবে।

উক্ত কনফারেন্স সমূহে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাঃ) 'র হৃদারত শেষ পর্যন্তই অব্যাহত থাকা মর্মে প্রতিভাত হয় যে, প্রকৃত অর্থে অপর কোন গাউসুল আ'যমের আবির্ভাবও আর হয়নি, বরং তাঁরই যুগবৃত্ত অব্যাহত। এতে করে কুতুবুল আকুতাবে যমান হযরত বাবা ভাণ্ডারী (রাঃ) কে 'ছানী গাউসুল আ'যম' বলার মর্ম আবারো স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তাঁর শানে প্রকৃত অর্থে গাউসুল আ'যম নয় বরং গাউসুল আ'যমের মতো বলেই প্রশংসা করা হয়েছে। অনুক্রম তদীয় মূর্শিদ কিবলা বাগদাদী (রহ.) 'র বিষয়টীও প্রকৃত অর্থে নয়, বরং ব্যক্তিগতের পর্যায়ভুক্ত বিষয় বলে এখানে আবারো স্পষ্ট হয়ে উঠে।

'কোন কোন সময় বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ রাহমাতুল্লিল আলমীন পেয়ারা রাসূল (স:) তশরীফ আনতেন' তথ্য সূত্রে প্রতিভাত হয় যে, গাউসুল আ'যমের স্বাধিকার-স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে না চাইলে সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মর্জির উপরই বিষয়টি পেশ করা হয়। আর একপ ক্ষেত্রে হৃদারতও তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আনিহী ওয়াসাল্লামা করে থাকেন বিধায় গাউসুল আ'যমের হৃদারত বিষয়ে 'প্রতিটি কনফারেন্সে' না বলে 'প্রায় প্রতিটি' বলা হয়েছে বুঝা যায়।

'মাইজভাণ্ডার শরীফ গেলে অলী হওয়া যায়' উক্তি মর্মে 'বেলায়তের দস্তুর বন্টনে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাঃ) 'র স্বাধীন ক্ষমতার বিষয় ইতিপূর্বে আলোচনায় এসেছে। এখানে বাগীটির ব্যাপকতর মর্মে আরো আলোচ্য বিষয় হল- দস্তুর আনুপাতিকের অতিরিক্তও আল্লাহর নৈকটি ধন্য বকুবিল্লাহর পর্যায়ভুক্ত অসংখ্য ওলীযুল্লাহ হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাঃ) 'র সান্নিধ্য ও তুরীক্বা-দর্শন যোগে অব্যাহত ধারায় সৃষ্টি হতে থাকার মতো বাস্তবে

শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী নিরঞ্জন প্রবন্ধ সম্ভার

দৃশ্যমান ক্ষমতার কথাও এ উক্তির মধ্যে বিবৃত হয়েছে। অতএব দৃশ্যমান বাস্তবতার সাথে মিলে যায় এমন বাগীটি সর্বস্তরের সুন্নী জনতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে, সঠিক পথের দিশা কখনো হারাতে না! কেননা এতে এটাও প্রতিভাত হয় যে, মাইজভাণ্ডারী তুরীক্বা-দর্শন চলমান যুগবৃত্তের জন্য এমনই নির্ভুল সিরাতুল মুস্তক্বীম, যা অবলম্বনে আল্লাহ তা'আলার নৈকটি লাভ করতঃ ওলীযুল্লাহ হওয়া যায়। এমন কি যেভাবেই হোক না কেন, হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাঃ) 'র কৃপা-দান লাভ করতে পারলে উক্তরূপ ওলীযুল্লাহ হওয়া যায়।

কিন্তু যে সব উত্তরসূরী মাইজভাণ্ডার শরীফ গেলেও সাধারণের কবর যিয়ারতের মতো যিয়ারত পূর্বক গাউসুল আ'যমের রূহের উপর ঈসালে সওয়াব করে থাকে, তারা কি 'মাইজভাণ্ডার শরীফ গেলে ওলী হওয়া যায়' মর্মে কহদয়ের কোনায়ও ঠাঁই দিয়েছেন? এমনকি শীর্ষস্থানীয় একজন সুন্নী আলোমেদ্বীন হওয়া সত্ত্বেও কোথাও বক্তব্য দিতে গিয়ে সাধারণের কবর যিয়ারতের সাথে তুলনা করতঃ বলতে শুনি "কবর যিয়ারতের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, নিয়ম বহির্ভূত বাদ্য বাজনার সাথে কবর যিয়ারতকে আমরা সমর্থন করিনা।" 'মাইজভাণ্ডার শরীফ গেলে ওলী হওয়া যায়' বানীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কী এমনই? অথচ বাদ্য বাজনা সহকারে সমা জাহেযের পক্ষে মাইজভাণ্ডার শরীফ থেকে বিশেষত শায়খুল ইসলাম আল্লামা ফরহাদাবাদী (রাঃ) কর্তৃক যে ফতোয়া গ্রন্থ আকারে সুদীর্ঘ অতীতে প্রদত্ত হয়, তা অদ্যাবধি অকাট্য রূপেই বিদ্যমান।



মাইজভাঞ্জারী ভূরিকার সত্যতার অন্যতম নিদর্শন
এ ভূরিকার অনুসারীগণ মৃত্যুর পরও অমর

ব্রাহ্ম হু তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হওয়া মহান হযরতগণ জীবিত ও
আত্মাহর পক্ষ থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত। এ বিষয়ে আল্ কুরআনুল করীমের বিভিন্ন
আয়াতে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বিদ্যমান। ইরশাদ হচ্ছে,

‘আল্লাহর রাস্তায় যারা নিহত হয়েছেন, তাঁদেরকে মৃত বলোনা, বরং তাঁরা জীবিত; পরন্তু তোমাদের অনুভূতি নৈহ’।^১ অন্য আয়াতে বিধোষিত,

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছেন, তাঁদের কখনো মৃত ধারণা করেনা; বরং তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত জীবিকাপ্রাপ্ত^১ ২ ইসলামের বহিঃশত্রু দমানের যুদ্ধে নিহত শহীদগণ যেমন সুস্বপ্ন জীবন লাভ করেন, অনুরূপ প্রভুর মিলান পথের প্রতিবন্ধকরূপী মহাশত্রু কুপ্ৰবৃত্তির বলিদান তথা আল্লাহর ইচ্ছায় উৎসর্গিত প্রেমের মরা মরেও অমর। মাটি, পানি ও আগুন তাঁদের দেহ বিনাশ করে না। মহানবী (দ.) কোন এক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সাহাবীদের সম্মোদন করে বলেন,

قال جهاد النفس -

‘ধানাবাদ তোমাদের! তোমরা ছোট জিহাদ হতে বড় জিহাদের দিকে অগ্রসর হয়েছ, আরম্ভ করা হল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! বড় জিহাদ কি?’ রাসূলগোত্র (দ.) ফরমান, ‘নফসের সাথে যুদ্ধ করা’ (বায়হাকী)। জিহাদে আকবর বা বড় যুদ্ধ তথা নফসের সাথে যুদ্ধ করে আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দেয় ইসলাম। এ যুদ্ধের সমরাস্ত্র রূপে আল্লাহ মু‘মিনদেরকে দু’টি জিনিষ দান করেছেন। যথা—ক. আল্লাহর জগালাভের তীতি ও খ. নফসকে স্বীয় প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করা। আল্ কুরআনের বাণী, *وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مَلَكُوتٌ وَفَصْلٌ مِّنْهُ* ‘যে আপন প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়াবার ভয় করে এবং নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে; তবে নিশ্চয় জান্নাত তাঁর ঠিকানা’।^১ আল্লাহ প্রদত্ত উক্ত সমরাস্ত্র দু’টির যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে নফসকে পবিত্র করার মাঝেই রয়েছে সফলতা। আল্ কুরআনের ঘোষণা, *يُفَرِّقُ بَيْنَهُمُ اللَّهُ بِالنَّفْسِ الْفَاسِقَةِ* ‘অবশ্যই সে সফলকাম, যে নফসকে পবিত্র করেছে’।^২ এ সফলকাম আমার সন্তানদের অমরত্বের নিদর্শন প্রদর্শন পূর্বক

আমরা হে তা'আলা দ্বীনে ইসলামের সত্যতার প্রমাণ জোরদার করেন যুগে যুগে। আল্লাহর রাসূলের দুই মহান সাহাবী সুদীর্ঘ তেরশত বছরাধিককাল কবর শরীফে অক্ষত থাকার ঘটনা ইসলামের সত্যতার বাস্তব একটি প্রমাণই বটে। তাইহীস নাদীর পানি কবরে ঢুকে পড়লে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) ইরাকের বাদশাহ শাহ ফয়সালকে কফিন অন্যত্র স্থানান্তরের জন্য স্বপ্নে নির্দেশ দেন। বারংবার আদিষ্ট হয়েও বাদশাহ বিষয়টি আমলে না নিলে বাদশাহকে বলার জন্য গ্র্যান্ড মুফতী স্পাদিষ্ট হন। অবশেষে গ্র্যান্ড মুফতীর পরামর্শক্রমে বাদশাহ ১৩৫১ হিজরী, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ ১০ জিলহজ্জ কফিন উত্তোলনের দিন ধর্ম করেন। হজ্বের মৌসুম হওয়ায় ১০ দিন পিছিয়ে ২০ জিলহজ্জ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অগণিত মানুষের সম্মুখে কবর শরীফ খুলে দেবেন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ও জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) উভয়ের কবরে সতিই পানি ঢুকে পড়েছে। তাঁদের শরীরে অবিরক ও তবুও উত্তোলন করে ৩০ মাইল দূরে সালমান ফার্সী (রা.)'র মাথারের পাশে সালমান পার্কে পুনঃদাফন করা হয়।

এ ঘটনা অবলোকনে বহু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ইসলামের সত্যতার প্রমাণ পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এক জার্মান চিকিৎসা বিজ্ঞানী তাঁদের চোখ দেখে সার্বশ্রমে মন্তব্য করেন, 'আমি কোন জীবন্ত মানুষের চোখও এত জ্যোতির্ময় দেখিনি। ইসলামের সত্যতার পক্ষে এর চেয়ে জ্বলন্ত প্রমাণ আর কি হতে পারে।' অতঃপর তিনি গ্র্যান্ড মুফতীর হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।^৫ সচিদ্র প্রতিবেদন দেখতে আগ্রহীগণ www.paksiyasat.com দেখতে পারেন।

আত্মাংশিকি অর্জনের শ্রাণী প্রশিক্ষণ ত্বরীকৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ। পক্ষান্তরে আত্মশুদ্ধি, সংস্কারকাম অমর ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি ত্বরীকৃতির সত্যতার প্রমাণও বটে। মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার অনুসরণে ঐক্লপ ব্যক্তি সৃষ্টি হওয়ার দাবী প্রমাণ বিহীন মুখের বুলি মাত্র নয়। বরং মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার অগণিত অনুসারী কবরে অবিকৃত-অক্ষত থাকার ঘটনা সেই যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত এ জলপদের মানুষ প্রত্যক্ষ করে চলেছে। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপিত হল।

১. হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (বা.)'র বিশিষ্ট খলিফা শাহসুফী মাওলানা সৈয়দ আব্দুস সালাম ভূজপুরী (বা.) ৪ পৌষ ১৯৪৯ সালে ইত্তিকাল করেন। তাঁকে ইদলপুরস্থ প্রসিদ্ধ বুঘূর্ণ বোডা শাহের মাযারের পাশে দাফন করা হয়। ইত্তিকালের প্রায় দেড় বছর পর তিনি বোডা শাহের সাথে তাঁর মশরবের মিল হয়েনা বনে নিজ পুত্র মাওলানা সৈয়দ মঈনুল হক ও মাওলানা সৈয়দ হাবিবুল হক ছাত্রবয়সকে স্বপ্নে ভাবত অন্যত্র স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তাঁরা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করে

তাবুত উত্তোলন করেন। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে কাফন খুললে দেখা যায় যে, পূর্ণিমার চন্দ্রবৎ চেহারা মুবারক হতে মুক্তার ন্যায় বিন্দু-বিন্দু ঘর্ম নির্গত হচ্ছে আর ওষ্ঠদ্বয় নড়ছে। তাবুত, কাফন ও শরীর মুবারক একটুও পরিবর্তনতো হয়নি বরং পূর্বের অপেক্ষা উজ্জ্বল ও সুস্বাণময় হয়েছে। অতঃপর তাঁকে নিয়ে বর্তমান মাযারস্থ স্থানে দাফন করা হয়।^{১৫}

২. হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র ভক্ত জনাব সৈয়দ আহমদ হুসাইন (রহ.) ও জালায়ারি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ইতিকাল করলে ফটিকছড়ির নানুপুরস্থ আজিজুল্লাহ দারগা মসজিদ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। ২৭ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত আবু আহমদের কবর খননখালে মাটি সরে পড়লে ৩৭ বছর পূর্বে দাফনকৃত আহমদ হুসাইন ছাহেবের পায়ের দিকের ভূমির শুভ্র কাফন দেখা যায়। এ ঘটনা কফিনের ছবিসহ জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।^{১৬}

৩. কুতুবুল আক্কাব শাহসুফী সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবাভাণ্ডারী (রা.)'র মেয়ের ঘরের নাতি শাহাদাদ সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম প্রকাশ গায়েবীন মাইজভাণ্ডারী (রহ.)'র মুরীদ মাওলানা আব্দুর রশীদ মাইজভাণ্ডারী (রহ.) ১৯৮৫ সালে ইতিকাল করেন। রাউজান নোয়াপাড়া ইউনিয়নের শেষ পাড়া গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। বিগত ২০/০২/২০১০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাঁর মাযারটি পুকুরে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে নিজ পুত্র এডভোকেট আতহার মিয়াকে মাযার সংস্কারের জন্য বার বার স্বপ্নাদেশ করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে আতহার মিয়া সংস্কারের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করেন। পরদিন ২৭ ফেব্রুয়ারি শ্রমিকগণ খনন কাজ শুরু করেন এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি মাটি সারাতে গেলে তাবুতের কিছু অংশ ভেঙ্গে যায়। এতে দুই যুগাধিক পূর্বের সাদা কাফন অবিকৃত দেখা যায়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও সাংবাদিকদের কয়েকজন কৌতূহল বশতঃ কাফন খুললে শরীর ও চেহারা সজীব দেখতে পান। স্থানীয় হাজার হাজার লোক ও বহু সাংবাদিক ঘটনাটি দেখতে ভীড় জমান। বহু জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিকে কফিনের ছবিসহ ঘটনাটি সবিস্তারে প্রকাশিত হয়।^{১৭}

৪. ফটিকছড়ি কাম্বনপুরের এক বারই মনোগ্রাণে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র ভক্ত অনুরক্ত ছিলেন। জীবদ্দশায় প্রায়শ গাউসুল আ'যমের দরবারে হাদিয়া-তুহফা আনয়ন করতেন। ওই হিন্দু বারই মরণকালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্পষ্ট উচ্চারণে কলিমায়ে তৌহীদ পাঠ করেন। তাঁর আত্মীয় স্বজনরা রাম-রাম বলে তাঁকে ঘরের বাইর করে দিল। দুপ-দুপ করে ঘটনাটি চুপিয়ে রাখল। কিন্তু ওই আদি সৌভাগ্যশীল বারই তৌহীদের

বাণী উচ্চারণ করতে করতেই মৃত্যু বরণ করল। হিন্দু ধর্মের রীতি অনুসারে তিথায় নিয়ে লাকড়ী ও পরিমাণ মত তৈল-ঘৃত দিয়ে আগুন দিল। পরন্তু হিন্দুরূপী ওই আকৃতি ও প্রকৃতিগত মু'মিনের ত্বকের উপরের অংশ কিছু কিছু দাহ হলেও বক্ষে দাগ মাত্র লাগেনি। তৈল-ঘি দ্বিগুণ বাড়িয়েও জ্বালাতে ব্যর্থ হয়ে লাশ ধূরুৎ নদীতে ফেলে দিল। ওই মু'মিনে হাকিকীর লাশ না মাছে খেল না পানিতে বিনষ্ট হল। ওই শবদেহ ভাসতে-ভাসতে এক যারগায় গিয়ে আটকে রইল। বর্ণনান্তরে ওই স্থানের বাসিন্দারা গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.) কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে অথবা পুলিশ লাশ তুলে নিয়ে গোসল ও জানাযা শেষে দাফন করেন।^{১৮}

৫. ফটিকছড়ির নিশ্চিন্তাপুর নিবাসী বৌদ্ধ ধননজয় হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য বার বার অনুরোধ করলেও হযরত আকদস (রা.) সম্মতি না দেওয়ায় মানস্কাম পূরণার্থে হযরতের পরম স্নেহভাজন পৌত্র অছিয়ে গাউসুল আ'যম শাহসুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হুসাইন মাইজভাণ্ডারী (রা.)কে সুপারিশের জন্য অনুরোধ করেন। অছিয়ে গাউসুল আ'যম হযরতের খিদমতে ধননজয়ের আর্জি পেশ করলে তিনি ধননজয়কে তালশ করেন। ধননজয় 'হুযর দাস হাজির' বলে হযরতের সম্মুখে করজোড়ে বসে পড়েন। হযরত (রা.) তাঁকে 'ভূমি তোমার ধর্মে থাক; আমি তোমাকে মুসলমান করলাম' বললেও তিনি বসে রইলেন। হযরতের খাদেম মৌলভী আহমদ হুফা কাঞ্চনগরী (রা.) তাঁকে পেছন হতে ইশারায় ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁকে হাকিকতে মুসলমান করা হয়েছে। এরপর হতে তিনি প্রায় সময় হযরতের হুজরায় তাঁর ছোঁহবতে সময় কাটাতেন। হযরতের বেহাল শরীফের পর বাবাজান কেবলার হুজরাতে প্রায় রাত কাটিয়ে দিতেন। তাঁর স্ত্রীর বর্ণনা মতে মৃত্যুর পর তাঁকে অলেকে স্বশরীরে বিচরণ করতে দেখেছেন।^{১৯}

উপরিক্ত বর্ণনালোকে সুস্পষ্ট যে, গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস ও তাঁর প্রবর্তিত ত্বরীকার অনুসরণে মরেও অমর হয় এমন সফল মু'মিন তথা প্রকৃত সুন্নী-মুসলমান হওয়া যায়। যুগ-যুগান্তরে মাইজভাণ্ডারী আশেক-ভক্তের লাশ কবরে অবিকৃত থাকে। মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার সত্যতার অনুকূলে ওইরূপ জ্বলন্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক দুর্জন এ ত্বরীকা ও এর অনুসারীদের বিপক্ষে অপপ্রচারে মেতে ওঠেছে। একদিকে মাইজভাণ্ডারী আশেক-ভক্ত কাল-কালান্তরে কবরে অবিকৃত থাকার প্রমাণ মিলে, অপরদিকে নামকরা বহু পীরকে মৃত্যুর পর পড়ে যাওয়ার ভয়ে বরফ দিয়ে রাখতে হয়; এতে কি হকু-বাভিলের পরিচয় মিলে না? তবুও সত্যকে সত্য বলতে কেন এত দ্বিধা?

মিথ্যাকে সভ্য রূপে প্রতিষ্ঠার অপতৎপরতায় মূল্যবান সময়ের কেন এ অপচয়? প্রশ্ন কয়টির সমাধানে দৈনিক জং পত্রিকার উজ্জ্বলিত্তে বিবৃত জার্মান চিকিৎসা বিজ্ঞানীর মতো কারো যুমন্ত বিবেককে নাড়া দেবে প্রত্যায় এ ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা; আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন।-আমীন।

তথ্যসূত্র:

১. সূরা বাক্বারা, ১৫৪ নং আয়াত।
২. সূরা আল-ই-ইমরান ১৬৯ নং আয়াত।
৩. সূরা আনুশারি আত, ৪০-৪১ নং আয়াত।
৪. সূরা শামস, ৯নং আয়াত।
৫. দৈনিক জং-পাকিস্তান, ৭ জুন ১৯৭০।
৬. রত্নাবিন্দু ২য় প্রকাশে প্রণীত গ্রন্থকার মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।
৭. দৈনিক ইতিফাক ২৮ ডিসেম্বর ২০০৪, দৈনিক চট্টগ্রাম মঞ্চ ২৯ ডিসেম্বর ২০০৪।
৮. দৈনিক পূর্বকোণ ১ ও ২ মার্চ ২০১০, দৈনিক ইনকিলাব ১ মার্চ ২০১০, দৈনিক চট্টগ্রাম মঞ্চ ১ মার্চ ২০১০ ও দৈনিক ডেসটিনি ১ মার্চ ২০১০।
৯. আঙ্গিনায়ে বারী ১ম প্রকাশ ২০৪-২০৭ পৃষ্ঠা।
১০. হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র জীবনী ও কারামত ষষ্ঠ প্রকাশ ১৯৮৫, ১৯২ পৃষ্ঠা।

হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাঃ) আল্লাহ

যুগে যুগে প্রশংসিত

তৌহিদুল আনোয়ার মুহাম্মদ আব্দুল হাই আল হাক্কানী

সমস্ত প্রশংসার একক অধিপতি আল্লাহ তা'আলা। মহগ্রহ আল কুরআনের সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, “আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামিন” অর্থাৎ ‘সমূহ প্রশংসা সমগ্র জগতের পালনকর্তা আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত।’^১ ‘কুনুত কনযান মখফীয়ান’^২ হাদীসে কুদসীর ধারাবাহ্য মতে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর প্রতিবিম্ব হেতু মাহবুবে খোদা সাত্তাল্লাহ তা'আলা আল্লাহি ওয়া আল্লা আলিহী ওয়াসাল্লাম এর পুতুংপবিত্র সত্তা পরম প্রশংসিত। কবি এ নিগূঢ় রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ বলেন, ‘আলহামদুর প্রশংসা যত, সব তোমারি সন্তুগত; মুহাম্মদের কিবা অর্থ এ নামে ডাকিলা কারে’^৩ মাদারাজুন নবুয়ত দ্বিতীয় খণ্ডের ২৫৭ পৃষ্ঠায় ইমাম বুখারীর তারিখে সগীরের উজ্জ্বলিত্তে হযরত আলী বিন যামেদের সনদে খাজা আবু তালিব বর্ণিত পংক্তি ‘ওয়া শাক্কা লাহু মিন ইসমাইলী লিয়ুজাল্লাহু, ফা যুল আরশি মাহমুদুন ওয়া হাযা মুহাম্মদু’ অর্থাৎ ‘আল্লাহ তা'আলা আপন হাবীবকে মহামহিম করার লক্ষ্যে নিজ নাম থেকে মাহবুবের নাম বের করেছেন; অতএব আর্শের অধিপতি মাহমুদ বা প্রশংসিত আর এ মহান রাসূল মুহাম্মদ বা পরম প্রশংসিত।^৪ বাস্তব ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলই মহানবী (দ.)'র প্রশংসায় মুখরিত দেখা যায়। শত্রুর চোখে ওই মহান সত্তার সুরত ও সিরাতে ক্রটি খুঁজে পায় না। যেমন- রোম সম্রাট হেরাকলের সাথে ইসলাম গ্রহণপূর্ব অবস্থায় আবু সুফিয়ানের দীর্ঘ কথোপকথনে মহানবী (দ.) সম্পর্কে মিথ্যাচারের প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও সঙ্গীর্ণ কর্তৃক মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হওয়ার লজ্জায় একটি শব্দও নড়চড় বলতে না পারা, নবুয়তের ঘোষণাপূর্বে নবী করিম (দ.)'র প্রতি মিথ্যাবাদিতার অভিযোগ আনয়ন না করার অকপট স্বীকৃতি ইত্যাদি।^৫ মাইকেল এইচ হার্ট ইসলাম ধর্মাবলম্বী না হওয়া সত্ত্বেও তার শত যগীরীর জীবনীতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীরূপে মুহাম্মদ (দ.)'র নাম সর্বপ্রাে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছেন। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুরকে স্বতঃস্ফূর্ত বলতে হয়েছে, “He was the master mind not only of his own age but of all ages”,^৬

হযরত গাউসুল আ'যম শাহসুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (রা.) গাউসুল আ'যম উপাধির কুতবুল আকুতাব-কুতবে মাদার হন বিধায় ‘আবদুল্লাহ’ তথা মাহবুবে খোদা (দ.)'র অনুগামীতায় মুহাম্মদ (দ.)'র ওয়াযিস বা উত্তরসূরী হিসেবে আল্লাহর ইসমে যাত ও সিয়াকতের এককরূপে আল্লাহর

নামসমূহের প্রতিটি নামে পরিপূর্ণ বিশেষিত-গুণাধিত^{১৭} এ ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তা'আলা আপন প্রশংসিত গুণাবলী সমেত তাঁর (গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়ারী) সত্তায় দীপ্ত বিধায় তিনি 'আবদুল হামীদ' রূপে সর্বমহলে প্রশংসিত; পরন্তু তিনি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো প্রশংসা করেন না^{১৮} ইবনে আরবীর ভাষ্য মতে কৃতবিদ্যেতে কুবরার আসনে অধিষ্ঠিত সত্তা 'রহিম মুহাম্মদীন'^{১৯} এবং সৈয়দ শরীফ জুরজানীর ভাষায় 'বাভিনু নবুয়্যতি মুহাম্মদীন'^{২০} হন বিধায় নবীকুল সম্মাট (দ.)'র পূর্ণ অনুগামী উক্তসূরী হেতু 'মুহাম্মদ' বা পরম প্রশংসিত ও 'আহমদ' বা অতি প্রশংসাকারী সত্তার পরিপূর্ণ মাযহার বা বিকাশস্থল রূপে সর্বত্র পরম প্রশংসিত ও আল্লাহর অতি প্রশংসাকারী সাব্যস্ত হন। বাহকল উলুম আল্লামা আবুল বরাকাত আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (রা.) বলেন, 'আহমদ মুহাম্মদ নামে মন-প্রাণ মধুময়; গাউসে আ'যম মাইজভাওয়ারী সেই মধুভাণ্ড হয়।'^{২১} জগতের সর্বত্র তাঁর প্রশংসার ঢাকঢোল বাজছে। কবির ভাষায়, 'জমিনে আদমকুলে আর্শে ফিরিশ্তাদলে, মারহাবা মারাহাবা ধ্বনি পড়িলরে।'^{২২} লক্ষ-কোটি মানুষের মুখে মুখে তাঁর প্রশংসাপথনি উচ্চারিত, সহস্র বই-পুস্তকে তাঁর প্রশংসাবাদ বিবৃত। তাঁর শান-মান-মর্যাদার বহুল চর্চা যুগ-যুগান্তরে চলে আসছে, ক্ষুদ্র এক নিবন্ধে তা সংকুলানতো হবেই না, তাছাড়া ব্যাপক চর্চিত বিধায় বর্ণনার অপেক্ষাকৃত রাখে না; সুতরাং কয়েকটি উদ্ধৃতি বরকত নাভের আশায় নিয়ে বিবৃত হল।

এক. মুজাদ্দিদে দ্বীন শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন হযরত আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রা.)'র ভাষায়, 'আমাদের মহামহিম দিশারী, পরম সম্মানিত পঞ্চপ্রদর্শক, সমূহ কামালাত বা ফযিলতে রকবানীর আধার, সমুদয় ফয়য বা আধ্যাত্মিক অনুগ্রহরাজির উৎস, যার প্রকাশ্য কার্যাবলী অলৌকিকতা, গুণ্ড ভাবধারাসমূহ প্রকৃত সভাজাত, যার নিদর্শনাবলী উদ্দিষ্টের সাক্ষ্য, রহস্যাবলী অতীষ্টের লক্ষ্য, যার পবিত্র অবয়ব 'তুর' সদৃশ, যার বৈশিষ্ট্য থেকে চির পবিত্র নূর দীপ্ত, যার মহৎ স্বভাব নূর' বিশেষ, যার গুণাবলী থেকে পবিত্রতার প্রচুর বলকায়, যার উন্মোচিত আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী মাহবুব খোদা (দ.)'র স্বশরীরে প্রভূমিলন কালে আল্লাহর সান্নিধ্যে বিশেষভাবে অবগত গুণ রহস্য বিশেষ, যার প্রত্যক্ষ বিষয়াবলী রাসুলুল্লাহ (দ.)'র মেরাজে পরিভ্রমণকালীন পরিপুষ্ট চাক্ষুষ জ্ঞানতত্ত্ব বিশেষ, যিনি আল্লাহর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, আল্লাহর সমুদয় গুণে গুণাধিত, আল্লাহর সমূহ রাজ্যে আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত গাউস বা প্রাণকর্তা গাউসুল আ'যম হযরত শাহ মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ কুদ্দিসা সিরফুহ'^{২৩}

দুই. আরিফে কামিল বাহকল উলুম আল্লামা আবুল বরাকাত আবদুল গণি

কাঞ্চনপুরী (রা.)'র বর্ণনায় 'হযরত গাউসে পাক হাবীবে ছাহেবে লাওলাক (রা.)'র সত্তা আকৃতি ও প্রকৃতি তথা সৃজন ও চরিত্রে প্রশংসিত। প্রকৃতপক্ষে সূরত-সিরাতে প্ররম্ব থেকে প্রাপ্ত ব্যাপিত প্রশংসিত ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর জাহেদী ও বাত্বুনী পূর্ণতায় প্রশংসিত ও সম্মানিত হওয়ার ক্ষেত্রে ঈমানদারদের দু'জনের মধ্যে মতটিকাত হতে না। বরং সকল মু'মিন হযরত গাউসে পাক (রা.)'র কামালিয়াতের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেন। তাঁর প্রশংসিত গুণজ সত্তা প্রশংসাকরণে যেমন প্রাপ্তচূড়ায়, অনুরূপ প্রশংসিত হবার ক্ষেত্রেও শীর্ষে। তিনি হামেদীয়ত বা প্রশংসাকরণত্ব ও মাহমুদীয়ত বা প্রশংসিতত্ব উভয় মর্যাদার পরিপূর্ণ সমাবেশকারী ছিলেন।

'মনের আনন্দে হই উৎসর্গ সে প্রিয় নামের
বাজে ঢঙ্কা আর্শ পরে যে মহা মর্যাদাবানের।
কতই মহান গুণাবলী গুণগাহীর বর্ণনা উৎকর্ষ
ভঙ্গুর লিখিতে শান লিখনী যে ধাতবের।
আহদিয়তের রূপদর্পণে বিরাজিত গাউসে পাক
আহমদী পূর্ণতার নক্সা মহান শান যে ইমামের।
'লিখ্য আপনি মহান আদর্শে' সুবচনের প্রতীক
সকল চরিত্র যে এই উচ্চ মর্যাদাবান শাহের।
প্ররম্ব থেকে প্রাপ্তব্যাপী প্রশংসিত ও প্রশংসক
তাই যে আহমদ নাম এই মহান উচ্চমানের।
মহান হযরতের উচ্চশান সুনিপুণ সমাবেশকারী
প্রশংসা কৃতত্ব-করণত্ব দুই মহান মকামের।
অভাগ্য বঞ্চিত ছাড়া তাঁর সুবিশাল শানের
মুনকের নহে কেউ সে সম্মানীদের শিরতাজের।
সে কে রাখেনা, তব দ্বারে আদরের শির?
গলি যে তোমার কাবা আম-খাস সকলের।
রাখ যদি আল্লাহর দীদারশা মকবুল মনে
মনোপ্রাণে চিহ্ন হও গাউসে পাকের নূরী চরণের'^{২৪}
তিন. আরিফ বিল্লাহ হাদী ইলাল্লাহ আল্লামা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রা.)'র ভাষায়-

'চলগো প্রেম সাধুগণ প্রেমেরি বাজার।
প্রেম হাট বসাইছে মাইজভাওয়ার মাঝার।
সেখা এক মহাজন, নূরে আলম গাওছন।
সাধুগণের প্রাণ হরিয়ে করেন বেপার।

প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে দুটা ফাটা দিন কিনিয়ে ।

সেকান্দরী আয়না তাতে করেন তৈয়ার ।

চিনিবিরে সাধুগণ সে কেমন রসিক জন ।

প্রভুর ভাণ্ডার জান হাতেতে তাঁহার ।

দাস হাদীর শক্তি হীন, দিতে নাহি পারে চিন ।

আহাদ আহমদ মাঝে মিমের দিওয়ার ১২৫

ওই মহান হযরতের প্রশংসা-প্রশস্তি বর্ণনায় জগতের সকল পণ্ডিত লেখক হলে, সকল বৃক্ষ কলম হলে, সব সাগর-মহাসাগরের পানি কালি হলে সবকিছু ফুরিয়ে যাবে কিন্তু প্রশংসা শেষ হবে না । সুতরাং নিজের অক্ষমতার অকপট স্বীকৃতি এবং আরিফ বিল্লাহ আত্মা আত্মা সালাম ভূজপুরী (রা) র ভাষায় সবিনয় মিলতি জানিয়ে ইতি টানছি ।

‘আয় গাউসুল আ'যম করকে করম মুখকো দেখা দাও ।

আতশে হিজরাকো বেছানত ছে বুঝা দাও ॥

ফুরকত কি আজলনে মোরে ইহ জানকো ছিনা ।

জামে দিদারছে উহ জান ফেরা দাও ॥

লে গেয়ি হোস ও হাওয়াছ-এ ছালাম বেদেল ।

মোসকে ওয়াছলতছে মোরে হোস করা দাও ॥

কিন্তি মোরে ইশককে দরয়ামে ডুবা হায় ।

নজরে মুহাম্মতছে মোরে কিন্তি লাগা দাও’ ১২৬

আল্লাহুমা আয়ল্লানা ফি বিলালি ‘আত্বিকাতি গাউসিকাল আ'যম ইলা ইউওমিন লা যিল্লা ফিহী ইল্লা যিল্লু রহমতিকা বিহরমতি হাবিবিকাল আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া সালাত্বাম ।

তথ্য সূত্র:

১. সূরা ফাতিহা ১নং আয়াত ।
২. আল ফতুহাতুল মক্কীয়াহ ৪র্থ খণ্ড ৪৩ পৃষ্ঠা ।
৩. প্রেমের হেম ৭ পৃষ্ঠা ।
৪. মকামে নবুয়্যাত ৩০৮ পৃষ্ঠা ।
৫. বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ।
৬. শত মণীষীর জীবনী ১৬ পৃষ্ঠা ।
৭. মুজাম্ম ইস্তালাহাতিস্ সুফীয়াহ ১২৬ পৃষ্ঠা ।
৮. প্রাগুক্ত ১৩৭ পৃষ্ঠা ।
৯. আল ফতুহাতুল মক্কীয়াহ ১ম খণ্ড ১৫১ পৃষ্ঠা ।
১০. আত্ রায়ীফাত ১২৫ পৃষ্ঠা ।
১১. গোলশানে ওশশাক দ্বিতীয় স্বর্ণ ২০নং গান ।
১২. প্রেম দর্পণ ১০ পৃষ্ঠা ১৩ নং গান ।
১৩. আত্ তাওজিহাতুল বহিয়্যাহ ৭ পৃষ্ঠা ।
১৪. আদ্বানয়ে বারী ১ম প্রকাশ ১৫৯-১৬০ পৃষ্ঠা ।
১৫. রত্ন সাগর ৩৪ পৃষ্ঠা ।
১৬. রত্নবিন্দু ২য় সংস্করণ ১১ পৃষ্ঠা ১নং গান ।

দুই গাউসুল আ'যম রাঈয়াল্লাহু আনহুমা'র দ্বিনী সংস্কার

এস এম জাফর ছাদেক আল আহাদী

উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী সত্তা যখন আপন পদমর্যাদায় বহল থেকে নিম্ন পদেও কার্য সম্পাদন করেন, তখন তা তুলনামূলক মহান ও অসাধারণে পরিগণিত হয় । গাউসুল আ'যম রাঈয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা'র দ্বিনী সংস্কারও অনুরূপ মহান ও অসাধারণ । তাইতো হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী রাঈয়াল্লাহু আনহু গুধু মুজাদ্দিদে দ্বীন নন, বরং দ্বীনকে পুনর্জীবিতকারী মুহীউদ্দীন খেতাবে বিভূষিত হওয়ার কথা সর্বজন বিদিত । আর হযরত গাউসুল আ'যম শাহ সাইয়্যদ আহমদুল্লাহ মাইজভাওয়ারী রাঈয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও একইরূপ দ্বীনকে পুনর্জীবিতকারী সাব্যস্ত হওয়ার কথা প্রতিভাত হয় উভয় গাউসুল আ'যম'র বাকী মর্মে । বাইরুত- লেবনান মুদ্রিত বাহজাতুল আসরার ৫৫ পৃষ্ঠায় হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী রাঈয়াল্লাহু আনহু স্বীয় অন্তরাত্মা (কুলব) সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখে পরিচিহ্নিত সত্তাই হন, হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়ারী রাঈয়াল্লাহু তা'আলা আনহু' । (বিস্তারিত জানার জন্য গাউসুল আ'যম অভিধা দ্রষ্টব্য) তিনি রাঈয়াল্লাহু আনহুও আপন মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের কথা বিবৃত করেন এভাবে- (ক.) ‘আমার নাম পীরানে পীর ছাহেবের নামের সাথে সোনালী অক্ষরে লিখা আছে’ (বেলায়তে মোতলাকা, নবম সংস্করণ-৮২ পৃষ্ঠা) । (খ.) ‘রাঈয়াল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম’র হস্ত মোবারকে দুইটি ‘তাজ’ বর্ণনাভরে টুপী ছিল; একটি আমার মাথায় পরিয়ে দেন, অপরটি আমার ভাই পীরান পীর শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী সাহেবের মাথায় পরানো হয়’ । (গ.) ‘আমি একদিন আমার ভাই পীরান পীর ছাহেবের সহিত কাবা শরীফে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলাম রাঈয়াল্লাহু আনহু (দ.)-এর ছদর মোবারক (ছিনা) এক অসীম দরিয়া । আমরা উভয়ে উহাতে ডুব দিলাম’ (জীবনী ও কেবামত, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০ পৃষ্ঠা) । অতএব উভয় গাউসুল আ'যম রাঈয়াল্লাহু আনহুমা পরস্পর সমকক্ষতায়, সমক্ষমতায়, সমপদমর্যাদায় ও সমাবস্থানে অসীন বিধায় একইরূপ উচ্চাঙ্গের মুজাদ্দিদে দ্বীন, উপরন্তু দ্বীনকে পুনর্জীবিতকারীও সাব্যস্ত হন ।

দ্বিনী সংস্কার ও দ্বীন পরিচিতি: দ্বিনী সংস্কার বিষয়ে অবগতির মৌলিক সূত্র হল- সাইয়্যদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ ফরমান:

ان الله يبعث لدينه رسولا من قبله صلى الله عليه وآله وسلم

অর্থাৎ: ‘নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে

এমন কাউকে পাঠাবেন, যিনি তাদের তরে তাদের বীন সংস্কার করবেন। (জাব্ব দাউদ শরীফ, ২য় খণ্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৩৬ পৃষ্ঠা)।

এখানে তাদের দ্বান' তথা এ উম্মতে মুহাম্মাদী সান্নাতিয়া তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার দ্বীন বলতে যা বুঝায় তা যথার্থরূপে উপলব্ধি করতে না পারলে, দ্বিনী সংস্কার এবং যুগসংস্কারক সম্পর্কেও যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। পবিত্র হাদিস শরীফের আলোকে অনাবিল এ দ্বীনের সৃষ্টিক্তুসার পরিত্রিতি নিম্নরূপ।

عن عمرو بن الخطّاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبته إلى ركبته وروّض كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله ﷺ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فإخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فإخبرني عن الاحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فإخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فإخبرني عن أماراتها قال إن تلد الأمة ربتها وإن ترى الحفاة العرة المرأة العالة رعاء الشاء يطاولو في في البنيان قال ثم انطلق فليت ملئاً قال لي يا عمرو اتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه

جبرئيل أتاكم يعلمكم دينكم

অর্থাৎ: ‘হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট যাকাকালীন হঠাৎ অধিকতর কালোচুল বিনিষ্ট ধরধরে দাদা পোষাকধারী এমন এক ব্যক্তি উদয় হলো, যার মাঝে মুসাফেরীর চিহ্নও দেখা যাচ্ছেনা এবং সে আমাদের কারো পরিচিতও নয়। আগন্তুক এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকটবর্তী হয়ে তাঁর দু’হাঁটু মোবারকের সন্নিকটে দোজানু পেতে উভয় হাত উভয় উরুর উপর রেখে বসল। এমনভাবে স্থায় সে বলল: হে অধিক প্রসংহিত সত্তা-মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ! আমাকে ‘ইসলাম’ সম্পর্কে পরিজ্ঞান দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করলেন, ইসলাম হল—তোমার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) আল্লাহর রাসূল, সালাত করেম

শানে গাভিসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী মাইজগাওঁ
তাম্রা
অনন্দ প্রবন্ধ সম্ভার

করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ্য-সুযোগ হলে বাইতুল্লাহ হজ্জরত আদায় করা। আগস্তুক বলল: আপনি সত্য বলেছেন। (বর্ণনাকারী হযরত ওমর রাঃদিয়াল্লাহু আনহু বলে) আমাদেরকে তাজ্জব করল যে, সেই নেজেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করছে, সেই সাথে প্রত্যানয়নও করেছে। আগস্তুক বলল: অতঃপর ঈমান সম্পর্কে জ্ঞাত করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ ফরমান: তোমার বিশ্বাস আনায়ন করা আন্তাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের উপর এবং ভালো-মন্দ তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস করা। আগস্তুক বলল: আপনি ঠিক বলেছেন। অতঃপর বলল: ইহুসান সম্পর্কে অবগত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ ফরমান: (ইহুসান হচ্ছে) আন্তাহ তাঁ'আলার ইবাদত এভাবে করা যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছে; যদি তাঁকে দেখতে না পাও তবে (ধ্যান করবে যে) নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখেছেন। আগস্তুক বলল: ক্বিয়ামত সম্পর্কে বিবৃত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন: এ ব্যাপারে জিজ্ঞেসিতজন জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞাত নয়। আগস্তুক বলল: তার নির্দর্শনাবলী সম্পর্কে সংবাদ দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করলেন: দাসী তার মালিককে প্রসব করা এবং খালি পা বিশিষ্ট বস্ত্রহীন অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ছাগলচরকদেরকে দালান নির্মাণে অহংকারযুক্ত প্রতিযোগিতা করতে তোমার দেখা। হযরত ওমর রাঃদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর আগস্তুক ব্যক্তি চলে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাকে বললেন, হে ওমর! প্রশ্নকারীটি সম্পর্কে জান কি? উত্তর দিলাম, আন্তাহ ও তাঁর রাসূল অধিকতর জ্ঞাত। তিনি (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বললেন: উনি জীব্রাইলই, তোমাদের মাঝে এসেছে তোমাদেরকে তোমাদের স্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য' (হাদীসটি হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকেও কিছু তারতম্যযোগে বর্ণিত)। বুখারী-১২ পৃষ্ঠা, মুসলিম-২৭ পৃষ্ঠা, মিশকাত-১১ পৃষ্ঠা)।

এ হাদীসে জীবাস্কিলীর মধ্যে দ্বিনে উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবং তার শিক্ষা বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। এতে করে এ দ্বিনের সংশ্লিষ্টতার হল- দরবারে মুক্তকা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার আপব রক্ষা, ঈমান, ইসলাম, ইহুসান এবং অদৃশ্যজ্ঞান এ পাঁচটি বিষয়ের সমন্বিত রূপ। আরেকটু খোলাসা করে বলতে গেলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাশীল না হলে ঈমান আনার প্রবন্ধই আসেনা এবং ঈমান ব্যতীত ইসলামও মূলতঃ কোন কাজে আসেনা।

আবার ইহুসান ব্যতীত ইহুসান পালনও অসম্ভব হইল এবং অদৃশ্যজ্ঞান অর্জিত না হলে পরিপূর্ণ ইহুসানের দাবীও দলিলহীন মিথ্যাচার বৈকি।

অতএব উক্ত পাঁচটি বিষয়ের সমন্বিত রূপই পরিপূর্ণ দ্বীনে উন্নতে মুহাম্মদী সান্নালাহ তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তদুপশ্লিষ্ট সংস্কারই দ্বীনী সংস্কার হিসেবে পরিগণিত হবে। এতেকরে যাবতীয় শাখা-প্রশাখাসহ ওই পাঁচটি বিষয়ের ক্ষেত্রে যে কোন ক্রটি-বিহুতি কিংবা ধূষ্টতাকে শোধরিয়ে, এমনকি প্রয়োজনে ওসবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও যথার্থ কার্যকরী নতুন কৌশল উদ্ভাবন পূর্বক হলেও এ দ্বীনের মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম করে তোলার মধ্যেই এ দ্বীনী সংস্কারের সার্থকতা প্রতীয়মান হয়।

তদুপশ্লিষ্ট এ দ্বীনী সংস্কারের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের বিষয়টিও এখানে লক্ষণীয়। সাইয়্যদুল মুরসালীন সান্নালাহ তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র সত্তা কেন্দ্রিক এ জ্ঞান বিবর্তিত বুখা যায়, উক্ত হাদীসে জীব্রাঈলীর অবতারণার ধরণ ও ভাষ্য মর্ম। কেননা হযরত জীব্রাঈল আলাইহিস সালাম এ জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে গেলেন, নিজে শিক্ষার্থী হয়ে সাইয়্যদুল মুরসালীন সান্নালাহ তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে শিক্ষাদাতার মহিমামণ্ডিত আসনে বাস্তবিকই সমাসীন অবস্থায় প্রদর্শন যোগে। অতএব ওই কেন্দ্রিকতায় বিবর্তিত জ্ঞানের উত্তরাধিকারীত্বই এ দ্বীনী সংস্কারের ক্ষেত্রে বিবেচিত। এতে করে অদৃশ্য জ্ঞান তথা ইল্হামে বাতেনতো বটেই ইল্হামে জাহিরের উত্তরাধিকারীত্বও বিবেচিত হওয়া অনিবার্য। কেননা হাদীস শরীফের বর্ণনালোকে জ্ঞানের দু'টি প্রকার রয়েছে। যেমন-

عن الحسن قال علم علمان فله في الغيب فذلك العلم والفتح وعلم على المسالك فذلك العلم عز وجل على ابن آدم

অর্থঃ 'হযরত হাসান রাঈয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইলম বা জ্ঞান দু'প্রকার। এক প্রকারের জ্ঞান অন্তর সংশ্লিষ্ট যা বিশেষ উপকারী জ্ঞানই বটে। অপরটি মৌখিক, যা আদম সত্ত্বানের উপর মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার দলিল' (দারেমী; মিশকাত-৩৭ পৃষ্ঠা)। এ মর্মে আল্ কুরআন প্রাসঙ্গিক রাসূলুল্লাহ সান্নালাহ তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার একটি বাণীও প্রণিধান যোগ্য। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঈ.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সান্নালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ইরশাদ হচ্ছে- ^{لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا يَسْتَلِئُ} অর্থঃ 'ভট্টার প্রত্যেকটি আয়তের রয়েছে একটি বাহ্যিক অর্থ এবং একটি অভ্যন্তরীণ অর্থ' (শরহুসুন্নাহ; মিশকাত- ৩৫ পৃষ্ঠা)।

অতএব উক্তরূপ জাহির ও বাতিন উভয় প্রকারের যথার্থ জ্ঞান এ দ্বীনী সংস্কারের ক্ষেত্রে বিবেচিত হওয়ার অনিবার্যতা বলাই বাহুল্য। অন্যথায় কোন না কোন

প্রকারের জ্ঞানের অভাবে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বুঝতে ব্যর্থ কারো দ্বারা পূর্ণাঙ্গ দ্বীনী সংস্কারের ধারণা আদৌ সম্ভব নয়।

উভয় গাউসুল আ'যম সংস্কার উপযোগিতা: দ্বীনী সংস্কার বিষয়ক পূর্বোক্ত হাদীস শরীফের আলোকে ওই সংস্কার সংশ্লিষ্ট দু'টি উপযোগিতা তথা যথার্থ দ্বীনী জ্ঞান সমৃদ্ধ হওয়া এবং শতাব্দীর শিরোভাগে সংস্কারমূলক অবদান রাখার অবকাশযুক্ত হওয়াকে পরিচিহ্নিত করা যায়। এ মর্মে উভয় গাউসুল আ'যম এ দ্বীনী সংস্কার উপযোগিতা নিম্নরূপ-

হযরত গাউসুল আ'যম শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী রাঈয়াল্লাহু আনহু উচ্চজ্ঞানার্জনের সাধনায় নিজ জন্মভূমি ছেড়ে জ্ঞানের তদানীন্তন প্রাণেকেন্দ্র বাগদাদে গমন করতঃ সময় উপযোগী সর্বোচ্চমার্গের দ্বীনীজ্ঞান তথা জাহেদী ও বাতেনী যথার্থজ্ঞান সমৃদ্ধ হন। কার্যক্ষেত্রে তাঁর যুগান্তকারী ওয়ায-নসিহত, লিখনী ও অসংখ্য কারামাত প্রকাশের বদৌলতে আপন যুগস্থ উচ্চমার্গের অন্যান্য জাহেদী জ্ঞানীরা যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছু হঠতে বাধ্য হন, তেমনি বাতেনী জ্ঞান সমৃদ্ধ অন্যান্যরাও তাঁর অধস্তনতা স্বীকার করতঃ সৌভাগ্যবান হন। তিনি রাঈয়াল্লাহু আনহু হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর ৪৭০/৪৭১ সনে জন্ম গ্রহণ করতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর ৫৬১ সনে বেসাল প্রাপ্ত হন এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শিরোভাগে দ্বীনী সংস্কারে শ্রেষ্ঠ অবদান রাখার অবকাশ ধন্য হন।

অনুরূপ হযরত গাউসুল আ'যম শাহ সাইয়্যদ আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী রাঈয়াল্লাহু আনহুও উচ্চজ্ঞানার্জনের সাধনায় সুদূর কলিকাতা গমন করতঃ একইরূপ সর্বোচ্চমার্গের দ্বীনীজ্ঞান তথা জাহেদী ও বাতেনী যথার্থ জ্ঞান সমৃদ্ধ হন। সেখানে কলিকাতা আলীয়া থেকে জাহেদী জ্ঞানের সর্বোচ্চ সনদ অর্জন করতঃ পর্যায়ক্রমে শিক্ষকতা, ওয়ায-নসিহত এবং আদালতের বিচারক তথা কাজীপদে সমাসীন হয়ে উচ্চতরের বহুমুখী জ্ঞান প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ইতোমধ্যে আধ্যাত্মিক জগতের তদানীন্তন সরদারে আউলিয়া তুরীকত জগতের পূর্ণাঙ্গী গাউসে যমান হযরত শাহ সাইয়্যদ আবু শাহমা মুহাম্মদ ছালেহ লাহরী আল ফাদেদী কুদ্দিসা সিররুহু কর্তৃক মুরাদ নির্বাচিত হয়ে এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুতুবের যমান শাহ সাইয়্যদ দিলাওয়ার আলী পাকবায় কুদ্দিসা সিররুহু'র ফুযযাত অর্জিত হয়ে সর্বোচ্চ বাতেনী জ্ঞান সমৃদ্ধ হন। অতঃপর যথা সময়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক অসংখ্য কারামাত প্রকাশসহ যুগান্তকারী আধ্যাত্মিক শাহানশাহী ও যথার্থ পরিজ্ঞান প্রবাহে সাধারণ থেকে শুরু করে যুগের বিরল তত্ত্বজ্ঞানী-মুহাঈক্বি সকলকেই উজ্জিসিত করে দেন। তাঁর প্রবর্তিত যুগান্তকারী মাইজভাণ্ডারী তুরীক্বা-দর্শনের মোকাবিলায় উচ্চতরের জাহেদী কিংবা বাতেনী জ্ঞানের অধিকারী অন্যান্যদের কেউবা নতশিরে পিছু হঠতে বাধ্য হয়, কেউবা

প্রশংসাকরী হয়ে এবং অধস্তনতা মেনে নিয়ে নৌভাগ্যবান হন। যুগসন্ধিক্ষণে তিনি রাধিয়াল্লাহু আনহুও হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দির ১২৪৪ সনে ভূমণ্ডলে আত্মপ্রকাশ করতঃ চতুর্দশ শতাব্দির ১৩২৩ সনে পর্দা করা যোগে, চতুর্দশ শতাব্দির শিরোভাগে দ্বীনী সংস্কারে যুগান্তকারী শ্রেষ্ঠ অবদান রাখার অবকাশে ধন্য। এ ব্যাপারে উভয় গাউসুল আ'যম রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জীবনী ও কেরামত ইত্যাদি গ্রন্থাবলী নিরীক্ষণীয়।

দ্বীনী সংস্কারে উভয় গাউসুল আ'যমের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব: ইতিপূর্বে দ্বীনী সংস্কার ও তদুপস্থিষ্ট উপযোগিতা বিষয়ক আলোচনা বিবৃত হয়েছে। তদুভিত্তিতে এবার উভয় গাউসুল আ'যম'র দ্বীনী সংস্কার বিষয়ক পর্যালোচনায় আসা যাক। এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য বিষয় হল, উভয় গাউসুল আ'যম রাধিয়াল্লাহু আনহুমা'র সত্তার বদৌলতে তথা উভয়েরই সান্নিধ্যে ও ত্বরীক্ব-দর্শনাগোকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অসংখ্য কামিল-মুকামিল ওলীয়ুল্লাহ সৃষ্টি হয়েছে (জীবনী গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য); যা তুলনামূলক উচ্চমানেরই দ্বীনী সংস্কার সাধিত হওয়ারই প্রমাণ বটে। কেননা উভয়ের সৃষ্ট ওই অসংখ্য কামিল-মুকামিল ওলীয়ুল্লাহগণের প্রত্যেকই পরিপূর্ণ দ্বীনদার তথা দরবারে মুক্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার আদব রক্ষাসহ প্রকৃত ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও অদৃশ্য জ্ঞানের ধারক-বাহক হওয়ার কথা সর্বজন স্বীকার্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য। আর এটিই দ্বীনী সংস্কারে উভয় গাউসুল আ'যমের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ।

সাধারণতঃ হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী রাধিয়াল্লাহু আনহুর 'দ্বীনী সংস্কার' গ্রন্থে তাঁর লিখনী, সাড়া জাগানো ওয়ায-নসিহত এবং ক্বাদেয়ীয়া তুরীকাহ্ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্বীনকে পুনর্জীবিত করার কথা অনেকেই তুলে ধরতে দেখা যায়। আর বস্তুবাদী গ্রীক দর্শন বিশেষতঃ সমসাময়িক প্রান্তমতবাদী শিয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিনাশ, সর্বমোট প্রান্তমতবাদী শিয়া ও চিহ্নিতকরণ এবং ইসলামী দর্শন, সংস্কৃতি ও সুন্নী মতাদর্শকে শক্তিশালী করে তোলাকেও তাঁর বিশেষ সংস্কার বলে পরিচিতি করতে দেখা যায়।

অনুরূপসূত্রে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাধিয়াল্লাহু আনহুর 'দ্বীনী সংস্কার'ও বিশেষভাবে পরিচিতিত হওয়া নক্ষণীয়। তিনি রাধিয়াল্লাহু আনহু আবির্ভূত হন বিশ্বমানবতার তথা চিরন্তন ইসলামের এমন এক বিপর্যয়কালে, যখন সারা বিশ্বে দ্বীনী শাসন, শাসক গোষ্ঠির কুকীর্তির কারণে বিলুপ্ত হয়ে ধর্মবিহীন রাস্ট্রনীতির পত্তন ঘটে। রাস্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারা বিশ্বমুসলিম হয়ে পড়ে আত্মবিরেক নির্ভরশীল। ধর্মকে পুঁজি করে ফায়দা লুণ্ঠার দলেরা বাধিয়েছে নানা দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং সমাজে সর্বত্র চলছে ধর্মের নামে জঘন্য গোড়ামীরই

দাপট। এমতাবস্থায় বিশ্বমানবতার মুক্তির নিমিত্তে মানুষের সংবিবেক জাগ্রত করতঃ ধর্মীয় উদারতায় উজ্জীবিত করে তোলার মহান ত্বরীক্ব-দর্শন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন এ সফল কাণ্ডারী হযরত কিব্বলা। তাঁর মহান ত্বরীক্ব-দর্শন ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রভাবে দ্বীনে উন্মত্তে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা নব জীবনে উজ্জীবিত হল। তাইতো উগ্রপন্থীদের দাপটপূর্ণ বিরোধীতা সত্ত্বেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সহাবস্থান তথা ধর্মসাম্যের দর্শন তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্ব-দর্শনের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামেরই আদলে পুনর্জীবিত হয়। মুসলিম না হয়েও যেমন শাহানশাহে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে টাঁই ছিল খাজা আবু তালিবেব তেমনি শাহানশাহে মাইজভাণ্ডার হযরত গাউসুল আ'যম শাহ সাইয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী রাধিয়াল্লাহু আনহুর দরবার সংশ্লিষ্ট সর্বত্রই টাঁই পেতে দেখা যায় ইসলামের হিতকামী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের। সকল ধর্মের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের একজাতীয় করণের মৌলিক ভিত্তি মদীনা সনাদে যেমন স্থাপিত, তেমনি আদর্শই পুনর্জীবিত ও লালিত হয়, মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্বের অন্যতম বিশেষ দর্শন 'তাওহীদে আদ্বইয়ান'র মাধ্যমে। ইসলামের প্রারম্ভিক পর্যায়ে নবদীক্ষিত মুসলিমের জন্য জানমালের নিরাপত্তা কিংবা পুনর্বাসন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ঈমান গ্রহণের কথা গোপন রাখার উপদেশ দ্বারা আচার ধর্ম পালনের বাধ্যবাধকতা মুক্ত থাকার সুযোগ যেমন ছিল, তেমনি আদর্শেরই সংস্কার হল মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্বায় পরিলক্ষিত 'বেলায়তে মোত্বা'ক্বা' দর্শন। বাস্তবিকই একজন অমুসলিম যখন প্রকাশ্য মুসলমান হয়ে আশ্রয়হীন অবস্থায় মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে শত মিনতি করেও টুকু আশ্রয় না পেয়ে পুনরায় স্বধর্মে ফিরে যেতে বাধ্য হয়, তখন এ মহান ত্বরীক্ব-দর্শনের অপরিহার্যতা ও সার্থকতা বিবেকবান মাত্রই উপলব্ধি করতে পারে। মূলতঃ এহেন যুগান্তকারী মহান ত্বরীক্ব-দর্শন যুগোপযোগী শ্রেষ্ঠ সংস্কারসহ দ্বীন ইসলামের যথার্থ মূলধারা হয় বলেইতো এর দীপ্তালোকে অসংখ্য কামিল-মুকামিল ওলীয়ুল্লাহ অব্যাহত ধারায় সৃষ্টি হতে দেখা যায়।



মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্বা-দর্শনের সংস্পর্শে রমেশ শীলরা

এস এম জাক্বার ছাদেক আল আহাদী

সাম্য-মৈত্রীর বন্ধন নিয়ে সকল ধর্মাবলম্বীদের সহাবস্থানের দর্শন, পবিত্র ইসলামেরই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঐতিহাসিক মদীনা সনদের শর্তালোকে সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার সংরক্ষণের বিধান, পবিত্র ইসলামেরই সুচিত গৌরব। এ গৌরবময় অধ্যায়, কালের বিবর্তনে মৃতপ্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে 'তাওহীদে আদ্বইয়ান' নামে নবোদ্যমে সংস্কার ভিত্তিক পুনর্জীবিত হল ইমামুল আউলিয়া ওয়াক্বরীকত হযরত গাউসুল আ'যম শাহ সাইয়্যাদ আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সত্তার বদৌলতে। এ দর্শনালোকের পথ ধরে রমেশ শীলরা মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে এসে যে সাফল্য লাভ করেছে তার ক্ষুদ্রতম অংশই এখানে বিবৃত হবে। ইত্যবসরে বলে রাখি— মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে রমেশ শীল প্রমুখের সংশ্লিষ্টতা প্রক্ষেপে বাস্তুকারী মুসলমানরা, স্বয়ং সাইয়্যাদুল মুরসালীন নবীর মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পরিবারেরই অমুসলিম সদস্য হযরত আবু তালিবারের সংশ্লিষ্টতা প্রক্ষেপে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে কি?

মূলতঃ পবিত্র ইসলামেরই দলিলের ভিত্তিতে রমেশ শীল প্রমুখের অবস্থান জন্মাতে হওয়া সুস্পষ্ট ভাবে সাব্যস্ত হয়। হযরত আবু মর রাধিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন:

«يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ عَلَى مَنْ عِدَّةٌ يَوْمَ يَأْتِيكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ» (যা মিন আব্দিন ক্বীলা লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহু হুন্মা মাতা আলা যালিকা ইল্লা দাখালাল জন্মাতা) অর্থাৎ: “যে

লাইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বনল, অতঃপর ওটার ওপর যত্নবরণ করল, এমন বান্দা

মাত্রই জন্মাতে প্রবেশ করবে” (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মিশকাত

শরীফ)। হযরত ওসমান রাধিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন: «يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ عَلَى مَنْ عِدَّةٌ يَوْمَ يَأْتِيكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ» (যা

মাতা ওয়াহুয়া ইয়া'লামু আনহু লাইলাহা ইল্লাল্লাহু দাখালাল জন্মাতা) অর্থাৎ:

“আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই তা নিশ্চিত ভাবে জানে এমন ব্যক্তি মাত্রই

যত্নবরণ করলে জন্মাতে প্রবেশ করবে” (মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ)।

এখানে যত্নকালীন কলিমা পাঠকারী তো বটেই, বরং ‘আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য

নেই তা নিশ্চিত ভাবে জানে এমন ব্যক্তি মাত্রই জন্মাতে প্রবেশ করবে’ মর্মীয় ঘোষণা সুস্পষ্ট।

এতদুভিত্তিতে ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু’র যিকর যখন মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্বা-দর্শনালোকে প্রচলিত প্রকাশ্য যিকর ও সেমা মাহফিলে বাদ্য বাজনার মূর্ছনায় ধবনিত হয়, তখন রমেশ শীল প্রমুখরাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সেখা একাকার হয়ে নিজেদের অবস্থান গড়ে নেন।

প্রমাণ স্বরূপ প্রথমতঃ রমেশ শীল প্রণীত বহু মাইজভাণ্ডারী গানের একটি এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। তিনি লিখেন:

লা এলাহা ইল্লাল্লাহু যটে সদা জপ মন

ভক্তি ভাবে দৃষ্টিকর দেখা যাবে নিরঞ্জন।

জ্বালাইয়ে জ্ঞানের বাতি জপের মন দিবারাত্রি

কৌটি চন্দ্র যিনি জ্যোতি আলোক সাঁই ভুবন মোহন।

তাহাকে দেখিবে যবে সকল জ্বালা জুড়াইবে

মন জুড়াবে প্রাণ জুড়াবে আর জুড়াবে দুই নয়ন।

[আশেক মাল্লা- ওনেং গান]

এ রমেশ শীল তনোমানে দিবারাত্রি সদা-সর্বদা ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু’ জপনা করার স্বাক্ষর রেখে গেলেন এ গানটিতে; যার হৃদয়স্পর্শী মর্ম ও সুর যুগযুগ ধরে বহু লোকের হৃদয়কে দোলা দিয়ে চলছে। জনশ্রুতি যে, রমেশ শীল কিংবা মতান্তরে গুরুদাস ফকির ইজিকাল বা লোকান্তর করলে হিন্দুরা অগ্নিদাহ করার এবং মুসলমানরা দাফন করার দাবী নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় উভয় পক্ষ মিলে এক ত্রিমাংসায় সম্মত হয় যে, প্রথমে মুসলমানরা দাফন করবে, তারপর তুলে নিয়ে হিন্দুরা অগ্নিদাহ করবে; কেননা অগ্নিদাহ করে ফেললে তো আর দাফন করা যাবে না। এতেকরে মুসলমানরা দাফন করার পর হিন্দুরা তাঁকে তুলে আনতে গেলে দেখা যায়— সেখানে সমাহিত ব্যক্তি আর দৃশ্যমান নয়, তদস্থলে ফুলেরই সমাহার দৃশ্যমান। ফলে সমাধিটি হিন্দু-মুসলিম উভয় পক্ষের জন্য যিয়ারতগাহ হিসেবে সমাদৃত হয়ে উঠে। তদুপরি এখানে ফুলেরই সমাহার দৃশ্যমান হওয়া আলোকে উজ্জ্বলিত বাস্তবতায় প্রতিভাত হয় যে, পবিত্র হাদীস শরীফ মর্মে প্রকৃত মু'মিন বান্দা যখন মুনকার-নকীর এর প্রেক্ষিতের সফলকাম হন তখন ফিরিশ্তাধ্বয় তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন—

«يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ عَلَى مَنْ عِدَّةٌ يَوْمَ يَأْتِيكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ» (নায কানওয়াতিল আক্বাসিল্লাযী লা

ইয়ুক্বিযুহু ইল্লা আহাবু আহলিহী ইলাইহি) অর্থাৎ ‘ওই নব দম্পতির মতোই

(প্রশান্তির) নিদ্রাচ্ছন্ন থাকো, যাকে সর্বাধিক প্রিয়জন ছাড়া অপর কেউ জাগায়

না।' (তিরমিযী-১২৭ পৃষ্ঠা, মিশকাত ২৫ পৃষ্ঠা)।

দ্বিতীয়ত: বাহরুল উলুম আল্লামা আবুল বারাকাত আবদুল গনী কাঞ্চনপুরী কাপদাঙ্গালাহ্ সিরাহুল 'আদিনায়ে বারী' গ্রন্থের ২৩৪ হতে ২৩৭ পৃষ্ঠা ব্যাপি সবিস্তারে বিবৃত এক হিন্দু বারইয়ের অবস্থা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

“কাঞ্চন নগর (কাঞ্চনপুর) নিবাসী এক হিন্দু বারই হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাধিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী ছিল। জীবদ্দশায় প্রায়শঃ গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাধিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে হাদিয়া-তুহফা পেশ করতো। মৃত্যুর প্রাক্কালে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কলমাময়ে শাহাদাত ও তাওহীদে ইলাহি পাঠ করতে লাগলো। এমতাবস্থায় তার আত্মীয়-স্বজনগণ রাম রাম বলে তাকে ঘর থেকে বের করে দিল এবং এ ঘটনা গোপন রাখতে সতর্কতা অবলম্বন করল। কিন্তু সে আদি সৌভাগ্যবানের জীবন ওই অটল বিশ্বাসে এ পবিত্র কলোমা শরীফ পাঠরত অবস্থায় অনাবিল মহা সন্তায় সমাপিত হল। অতঃপর স্বজনরা তাদের রীতি অনুযায়ী চিতায় অগ্নিদাহ করতে গিয়ে অধিক মাত্রায় চেষ্টা করেও যখন ওই হিন্দুবাহরইরূপী সর্বাঙ্গিক মুসলমানের লাশ জ্বালাতে ব্যর্থ হল, তখন লাশটি ধূরং নদীতে ফেলে দিল। লাশটি ভাসতে ভাসতে কোন এক জায়গায় নদীতে আটকে রইল। কেউ কেউ বলেন, লাশটির গোসল, কাফন, নামাযে জানাযা ও দাফনের ব্যবস্থা করতে ওই স্থানের লোকেরা দরবারে গাউসুল আ'যমের পক্ষ থেকে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ঐ সব সম্পন্ন করেন। বর্ণনান্তরে পুলিশ এসে লাশটি তুলে নিয়ে দাফন করেন।”

পূর্বোক্ত হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবং ঘটনাধ্বয় সমন্বয়ে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্বা-দর্শনের সংস্পর্শ ধন্য রমেশ শীল প্রমুখরা এমনই সার্বক মুসলমান হয়ে থাকে যাদের অবস্থান হবে জিন্নাতেই। এ ভাবে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাধিয়াল্লাহু আনহুর ত্বরীক্বা-দর্শনের সংস্পর্শধন্য বৌদ্ধ ধনজয়, হিন্দু মুন্সেফ অভয়চরণ চৌধুরী, মন মোহন দত্ত ও গুরুদাস ফকির সহ বহু পুণ্যাত্মকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায়। তবে প্রবন্ধের কালের বুদ্ধি পেয়ে বিরক্তিকর ঠেকার আশংকায় তা থেকে মাত্র তৃতীয় আরেকটি ঘটনা ব্যাখ্যা সহ বিবৃত করে সমাপ্ত করব ইনশা আল্লাহ।

তৃতীয়ত: এছিয়ে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী হযরত শাহসুফী মাওলানা সৈয়্যদ দেলাওর হোসাইন কাপদাঙ্গালাহ্ সিরাহুল সংগৃহীত তথ্য মূলে মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ডুইয়া কর্তৃক লিখিত জীবনী ও কেবামত গ্রন্থ ষষ্ঠ সংস্করণের ১৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত:

“জানব শাহসুফী মৌলানা জৈয়দ দেলাওর হোসাইন জাহের বর্ণনা করেন- আমি রোজ সকালে হজরতের সহিত চা পানে অভ্যস্ত ছিলাম। তিনি আমাকে ছাড়া চা নাস্তা খাইতেন না। একদিন সকালে নাস্তার সময় নিশ্চিন্তাপুর নিবাসী বৌদ্ধ ধনজয় নামক এক ব্যক্তি আসিয়া হজরতের নিকট ইছলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি হজরতের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। হযরত তাহাকে সম্মতি না দেওয়ায় তাহার মনস্কাম পূরণার্থে আমাকে তাহার জন্য হজরতের নিকট সুপারিশ করিতে অনুরোধ জানান। আমি হজরতের নিকট তাহার আর্জি ও বাসনা পেশ করি। ইহাতে হজরত ‘ধনজয়কে’ তালিশ করিলেন। ধনজয় ‘হজুর দাস হাজির আছি’ বলিয়া হজরতের সামনে করজোড়ে বসিয়া পড়িলেন।

তখন হজরত তাহাকে বলিলেন, মিঞা! তুমি তোমার ধর্মে থাক। আমি তোমাকে মুছলমান করিলাম। ইহার পরও তিনি বসিয়া রহিলেন। হজরতের খাদেম মৌলভী আহমদ হুফা কঞ্চনগিরি ছােব তাহাকে পিছন হইতে ইশারা করিয়া ডাকিয়া নিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে তাহাকে হাকিকতে মুছলমান করা হইয়াছে। ইহার পর হইতে তিনি প্রায় সময় হজরতের হজরায় তাঁহার ছোহবতে সময় অতিবাহিত করিতেন। হজরতের ওফাতের পর বাবাজান কেবলার হজরতে প্রায় রাত কাটাইয়া দিতেন। তাহার স্ত্রী আমাকে একদা বলেন যে, তাহার মৃত্যুর পরও তাহাকে স্বশরীরে বিচরণ করিতে অনেকে দেখিয়াছেন। তাহার নির্দেশ ক্রমে তাহার মৃতদেহ চিতায় অগ্নিদাহ না করিয়া সমাহিত করা হয়। এইরূপ বহু হিন্দুভক্তকে চিতাগ্নি জ্বলাইতে অক্ষম হওয়ার পরে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।”

এ ঘটনা প্রবাহে বৌদ্ধ ধনজয়কে স্বধর্মে বহাল রেখে মুসলমান করার বিষয়টি প্রচলিত নিয়মদুষ্টে জটিল ঠেকলেও ‘তিরোধানের পর তাঁকে স্বশরীরে বিচরণ করতে অনেকেই দেখেছেন’ বলে সাম্প্র্য মর্মে বুঝা যায়, তিনি একজন অসাধারণ সম্বল-সার্থক মুসলমানেরই পরিণত হন। আর তিনি যে একজন ঈমানদার মু'মিন তাতো এখানে সুস্পষ্টই। কেননা পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার আকুল আরেদন ব্যক্ত করা মর্মে- ‘তাসুদী-কু বল জানা-ন ওয়া ইক্বার-র বল লিসা-ন’ অর্থাৎ: ‘পবিত্র ইসলাম ধর্মের সত্যতা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তি’ পাওয়া গিয়েছে বিধায় হানাফী মাহাব অনুসারে তিনি প্রকাশ্য মু'মিনই সাব্যস্ত হন। এতদসত্ত্বে স্বধর্মে বহাল রেখে মুসলমান করার মর্ম হবে- বাহ্যিক দৃষ্টিতে বৌদ্ধ হলেও অন্তরগত অবস্থা বিবেচনায় তিনি একজন প্রকৃত মুসলমানই। মৌলিক সূত্রে তা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন এক বিশেষ ব্যবস্থারই অন্তর্ভুক্ত, যা পবিত্র ইসলাম ধর্ম সম্মতই বটে। যেমন: ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিপূন

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মক্কাবাসীদের ঈমান ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণকে গোপন রাখতে বলা হয়েছিল, তদ্রূপ ধননজয়ের বেনামেও পাণ্ডুর জীবন ধারণে প্রতিফুল অবস্থা থেকে রক্ষার নিমিত্তেই এহেন বিশেষ ব্যবস্থা সমৃদ্ধ সংস্কার সার্বকই।

পক্ষান্তরে আমাদের যুগের বাস্তব অবস্থা এই যে, অন্য ধর্মাবলম্বী কেউ মুসলিম হয়েছে শুনে খুশী হতে আমি বহুজনকে দেখেছি, কিন্তু নব্য মুসলিমিটি সাহায্য প্রার্থী হয়ে মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে ফিরেও পর্যাপ্ত সাহায্য পাওয়াতো দূরের কথা, বরং সন্দেহের দৃষ্টিবাহে জর্জরিত হয়ে পুনরায় স্বধর্ম ফিরে যাবার খবরও আমি শুনেছি! অনস্বীকার্য সত্য যে, নব্য মুসলিমিটির জন্য নেই কোনরূপ পুনর্বিন্যাস ব্যবস্থা; নেই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকার সুলভ কোন সুযোগ; এমনকি রীতিমত দুবেলা দু'মুঠো খাবার জোটানো পর্যন্ত দুক্লহ হয়ে পড়ে! এমতাবস্থায় হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়ারী রাশিয়ানরাহ তা'আলা আনন্ড কর্তৃক ওই ধননজয় প্রমুখকে কেন্দ্র করে দেওয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম সম্মত দর্শনটি অতি উত্তম ও সার্বকই বটে। এহেন সার্বকতার অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই হলো ধননজয়, রমেশ, মনমোহন, অভয়চরণ ও গুরুদাস ফকির প্রমুখের মতো পুণ্যআরা: যারা অসাধারণ মুসলমান বৈকি।



ফুলে ফুলে ফুলন্ত

গাউসে আ'যম মাইজভাওয়ারীর ফুল বাগান

বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শাকিউল বশর

“গাউসে ধনের প্রেম বাগানে নিরঞ্জন কৃপাঞ্জে, প্রেমের বসন্ত ঋতু আসিলরে।”

ঋতুরাজ বসন্তের ছোঁয়ায় প্রকৃতি যেমন ফুলে-ফলে-মাগে ভরে ওঠে, অনুকূপ হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়ারী (রা.দি.)'র শুভ আগমনে সৃষ্টির সর্বত্র প্রেমের বান ডেকেছে। ধরনী ও গগণে বাজেছে তাঁর প্রেমের জয় ঢংকা। এ জয়ধ্বনি কুরআন-এ করীমের সূরা বাকারার ১৮ নং আয়াত মর্মে 'বর্ধির' জনদের কর্ণে প্রবেশ করুক বা না করুক। আরিক কবি মকবুলের ভাষায়—

“জমিনে আদম কুলে, আর্শয়ে কেবেরতা দলে, মারহাবা মারহাবা ধ্বনি পাড়িলরে।
খোদা ও মোস্তাফা বলে, মকবুল অধমে বলে, চলে আলা এ কি বাহার হইলরে।”

ইমামুল আউলিয়া হযরত গাউসুল আ'যম শাহসুফী সৈয়দ আহমদুত্তাহ মাইজভাওয়ারী (রা.দি.)'র নূরানী পরশে পরশমণিরূপ অসংখ্য আউলিয়া সৃষ্টি হয়েছেন। স্বয়ং হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়ারী (রা.দি.)'র ভাষায়— ‘আমার এক লক্ষ চব্বিশ হাজার ফিরিশতা আছে’। হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়ারী (রা.দি.)'র উক্ত অমৃত বানীর ব্যাখ্যায় বাহকুল উনুম আল্লামা আবুল বরাকাত আবদুল গনি কাঞ্চলপুরী (রা.দি.) লিখেছেন, ‘আযিয়া (আ.)’র সমসংখ্যক সংখ্যা উল্লেখ এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার রুবানী ফযমে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার জন মানবীয় কদর্যতা ও নফসানী পঙ্কিলতা মুক্ত হয়ে নূরানী-রুবানী পবিত্র অবয়ব লাভে ধন্য হয়েছে। এ বিষয়টির সম্পাদন ব্যক্ত হোক বা শুভে। (প্রত্যেক নবীর নাম-পরিচয় কুরআন ও হাদীসে বিবৃত হয়নি বলে তাঁদের অস্তিত্ব অস্বীকারের যেমন জো নেই, অনুরূপ গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়ারী (রা.দি.)'র সংস্পর্শন্য বিপুল সংখ্যক অনিদের নাম-পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত বলে উক্ত সংখ্যার ক্ষেত্রেও সন্দেহের অবকাশ নেই।) উক্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আলির সকলই বিলায়তে ওজমার পদমর্যাদায় উপনীত হয়ে জগতের পথপ্রদর্শক ও ফয়যপ্রদ হয়েছেন; যেমনি নবীগণ জগতের পথপ্রদর্শক ও ফয়যদাতা। অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেক অলি এক-একজন নবীর প্রতিনিধি এবং এক একজন অলির বিলায়ত এক একজন নবীর নবুয়তের অধীনস্থ’। (সূত্র: আদ্বানা-এ বারী ফী তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাওয়ারী (রা.দি.), প্রথম প্রকাশ, ১৫০ পৃষ্ঠা) কাঞ্চলপুরী (রা.দি.)'র উক্ত ব্যাখ্যার যথার্থতা নিম্নোক্ত হাদীসে পাকের আলোকে প্রমাণিত। ইরশাদ হচ্ছে,

عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ ما من نبي الا له نظير في امته
فايوكر نظير ابراهيم وعمر نظير موسى وعثمان نظير هارون وعلي نظير من سوره
ان ينظر الى عيسى ابن مريم فليظن الى ابي ذر-

‘হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা
ইরশাদ ফরমান, এমন কোন নবী নেই, যার নমুনা আমার উম্মতে নেই।
অতএব, আবু বকর (রাঃ) ইব্রাহীম (আ.)’র, ওমর (রাঃ) মুসা (আ.)’র,
ওসমান (রাঃ) হারুন (আ.)’র, আলী (রাঃ) আমার (মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার) নমুনা এবং যে মরিয়ম
তনয় ঈসা (আ.)কে দেখে উৎফুল্ল হতে চায়, সে যেন আবু যর (রাঃ)কে
দেখ’। (আল খাসায়িসুল কুবরা, ২য় খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা)

আঙ্গিনা-এ বারী শরীফের উক্ত বর্ণনা আলোককে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী
(রাঃ) ‘র খলিফাগণের শান-মানের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। বাগে আহমাদীর
পুস্তক পদ্য খলিফাগণ জগতের আনাচে-কানাচে প্রাণের সাড়া জাগিয়েছেন।
কবির ভাষায়-

‘ফুলের সুগন্ধি এল মুদা দিল বিনদা হল + অমর নগর পছ খুলিলের’।

অভক্তি-অশ্রদ্ধার সর্পিতে কারো শ্রাণেন্দ্রিয় বিকল হলে সে পুষ্প-সুগন্ধি না
পাওয়াই স্বাভাবিক; এতে ফুলের কিছ্র যায় আসেনা। তদুপরি ফুলের
সুবাসতো আর বেলতা-ভিন্নকলকে বিমোহিত করবেনা, বরং অলি-বুলবুলই
বিভোর হয়ে তান ধরবে। কবির ভাষায়-

‘ফুটছে নূরী গোলাপ ফুল, ফুটছে নানা অলিকুল + বুলবুল দল প্রেম রোলে গাহিলের’।
ওই বাগানের গোলে গোলাপ ফুল) কুতুবুল আকুতাব হযরত শাহসুফী
সৈয়দ গোলামুর রহমান (রাঃ) ‘র সুবাসে বিমোহিত হয়ে গাযীয়ে মিল্লাত
আল্লামা সৈয়দ আযীযুল হক শেরে বাংলা (রাঃ) লিখেছেন,

“বা-খিত্তাবে বাবাজান কিবলা শুদাহ মান্হু-র দাঁ-,”

উ-স্তলে-আয বা-গে আঁ- শা-হ আহমাদুল্লাহ বে-শুমাঁ-

বু-য়ে আঁ- গুল করদাহ শায়দা- সা-য়েরে- আহলে জাঁহ,

গশত মাইজভাণ্ডার-র আয আঁ-জা- সাজদাহুগা-হে ‘আশিকাঁ’-

‘বা বা জান কিবলা খেতাবে প্রসিদ্ধ হলেন জানের,

নিশ্চয় সে শাহ আহমাদুল্লাহর বাগানের এক ফুলের।

ঐ ফুল-সুবাস করল বিভোর জগতবাসী সকলেরে,

আশেকদের সিঁজদাহুল হতে একটি হলো মাইজভাণ্ডারে।”

গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাঃ) ‘র অগণিত খলিফাদের সকলের প্রতি
ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপনপূর্বক এখানে শুধু একজনের একটি ঘটনার উল্লেখ করছি,

যাতে পার্শ্ববন্দ অন্যান্যদের মর্যাদা অনুধাবনেও সমর্থ হবেন। ঘটনার বিবরণে
প্রকাশ, ‘হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাঃ) ‘র বিনায়ত প্রচারের প্রথম
দিকে এক রাতে তিনি তাঁর প্রতিবেশি মুয়াযযিন সা‘আদ উল্লাহকে একটি পাকা
কলা খেতে বলেন। মুয়াযযিন সাহেব কাশির অজুহাতে শীতের রাতে কলা খেতে
অস্বীকৃত হলে হযরত ‘এখানে কে আছে’ বলে আওয়াজ দেন। শুনে জাফর
আলী করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘হুয়া! বান্দা জাফর আলী আছি’। হযরত
(রাঃ) সা‘আদ উল্লাহকে পুনরায় বললেন, ‘দেখুন এ কলাটি আপনার জন্য
রেখেছিলাম, এখন জাফর আলী চাচ্ছে, তাঁকে দেব কি?’ মুয়াযযিন সাহেব ঠাণ্ডার
সময় কলা খেতে পারবেনা মর্মে অক্ষমতা প্রকাশপূর্বক দিয়ে দিতে বললেন।
হযরত গাউসে পাক (রাঃ) কলাটি জাফর আলীকে দিলে, তা খাওয়া মাত্র তাঁর
হাল ও জ্ববা গালের হয়। তিনি সারারাত অত্যধিক মস্তি ও জ্ববা হালে
বকবাকি করতে থাকেন এবং সকাল হতেই আগত হাজতী-মকছুদীগণের হাজত
সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করেন। একজন লোক অসুস্থ সন্তানের রোগ
মুক্তির প্রার্থনা নিয়ে হযরতের খিদমতে এলে জাফর আলী তাকে তিন সন্তানের
মৃত্যু সংবাদ দেন। এতে লোকটি সক্রন্দনে হযরতের সমীপে পড়ে পড়েন।
হযরত দেখলেন ঠিকই সন্তান মারা গিয়েছে। অতএব, তিনি জাফর আলীকে
হিজরতের নির্দেশ দেন এবং এরূপ বলতে নিষেধ করেন। হিজরতের সময়
জাফর আলী শাহ তাঁর পড়শি জিয়াউল হুসাইনকে বললেন, ‘দেখ জিয়াউল
হুসাইন, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি প্রায়শ আমাকে সাহায্য করে থাক।
তদুপরি বাবাও তোমাকে ভালবাসেন। সুতরাং আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই।
তুমি বল, ‘হে জাফর আলী শাহ! বাবা তোমাকে যেদুপ করছেন, তুমি
আমাকেও এরূপ করে দাও’। কারণ এ নিয়ামত না চাইতে দেওয়ার রীতি
নেই’। জিয়াউল হুসাইন তাঁকে উপহাস করে বললেন, ‘আপনার কাছে একটি
খলে, একটি লাঠি ও একটি লোটা এ-ই তো’। প্রত্যুত্তরে জাফর আলী শাহ
বললেন, ‘আমার যা আছে, সাত বাদশাহর কাছেও তা নেই। আমি বাবার রঙ্গিন
দরিয়ায় ডুব দিতে এবং নিজেকে রঙ্গিন করতে শিখেছি। তোমাকে দিলে তা
কমবেনা বরং আমি ডুব দিয়ে তা পূরণ করে নেব। তোমার কপালে যেমন দু’টি
চোখ আছে, অনুরূপ অন্তরেও দু’টি চক্ষু রয়েছে। তুমি আমাকে বললে বলা
মাত্রই আমি তোমার অন্তরের মুদিত আঁখি উন্মোচিত করে দেব। তখন তুমিও
আমার মত দেখতে পাবে’। জিয়াউল হুসাইন বলল, আপনার পথে আপনি যান,
পাণলামী করবেন না’। তিনি অবুঝ জিয়াউল হুসাইনের কথায় রাগ না করে
আফসোস করে বললেন, ‘তুমি এখনও ছোট মানুষ, বুঝ হয়নি’। অতঃপর খলে
হতে এক জোড়া খড়ম বের করে বললেন, ‘তোমার বুঝ হলে এর কদর বুঝবে।
তখন এ খড়ম জোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে বলবে, ‘হে আব্বাহ! তুমি এ খড়মের
বরকতে জাফর আলী শাহ আমাকে যা দিতে চেয়েছেন, তা দিয়ে দাও’। তখন

তুমি আমার মত হয়ে যাবে। তোমার আমাকে এ খড়ম দু'টি আতর মেখে সাদা কাপড়ে বেঁধে বাসে রেখে দিতে বলবে'। জিয়াউল হুসাইন ঘরে গিয়ে তার মাতাকে না পেয়ে খড়ম জোড়া গোলার নীচে রেখে দিল। জাফর আলী শাহ পুনঃ ফেরত এসে তাকে খড়ম জোড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে সে গোলার নীচে রেখে এসেছে বলে জানায়। তখন জাফর আলী শাহ বলে ওঠলেন, 'আরে কমন্বত! তোমার কপালে নেই। আমি তোমাকে দিতে চেয়েছিলাম'। পরে তার মাতা স্থলে খড়ম দু'খানা তালপাশ করে নিতে আদেশ দিলে গিয়ে দেখল যে, খড়ম জোড়া যথাস্থানে নেই'। (জীবনী ও কার্যমত ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা)

উক্ত ঘটনা প্রবাহে প্রতিভাত যে, গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাহি) স্ব-অধিকারের বিলায়ত দানে যে কাউকে মালোনিত করতে পারেন। তাঁর স্পর্শিত একটি কলার বরকতে বিলায়ত প্রাপ্ত একজন ওলীর খড়মের বরকতেও বিলায়ত তথা গাউসুল আ'যমের নিয়ামত লাভ করা যায়। গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাহি) 'র খলিফার বিলায়ত ক্ষমতা যদি এমনই হয়, তবে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাহি) 'র শক্তি কেমন হবে? আছে কার এমন হিম্মত? যে ওই কুল-কিনারা বিহীন মহাসাগর গজ-কিতায় পরিমাপের দুগুণাংস দেখাতে পারে! সুফী কবি বলেন,

'গাউসে আ'যম বাহরে রহমত কতরায়ে ইকরামে উ দীগর আঁরা বাহর বাশদ পস কুজা আঞ্জামে উ'।

অর্থঃ: 'গাউসে আ'যম দয়ার সাগর কুপারিন্দু তাঁর, অন্যের তরে হয় সাগর ফের কোথা প্রাপ্ত তাঁর?'

উল্লেখ্য যে, গাউসুল আ'যম (রাহি) 'র দয়্যাবিন্দু য়ারা লাভ করেছেন, তাঁরা আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতায় দু'জগতে সাফল্য মণ্ডিত ও অমুখাপেক্ষী হয়েছেন। খলিফায়ে গাউসুল আ'যম হয়রত আল্লামা সৈয়দ আব্দুল সালাম ভূজপুরী (রাহি) যথাধাই লিখেছেন-

'গরতু করে একুই নজর ইস ছালামে নাপাক পর, হুঁ ময় গনি-এ লোজাহাঁ অরনা হুঁ ময় শমছোকমর'।

(রত্নবিন্দু, ৪৮৫ গান)

খলিফায়ে গাউসুল আ'যম হয়রত আল্লামা সৈয়দ আব্দুল গনি কাঞ্চনপুরী (রাহি) যথাধাইন কণ্ঠে বলেন,

'কলির পাপী তরাইতে, আসিল সে এ ভবেতে,

ভক্তি কৈরে নাম নিতে, দু'কূলে তরিয়া যায়।

সে সকলের শিরোমণি প্রেমাকাশের দিনমণি,

ঈমান জোতে করে ধনী যে মিলে সে নুরী পায়।

সাফল্য জীবন আর, সাফল্য নয়ন তার,

তান নুরী পদ যেন, জীবনে দেখিতে পার'। (প্রেম দর্পণ, ১০ নং গান)

গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাহি) 'র দত্তদান অকাতরে বিলিয়ে গেলেও ফুরোয়না। খলিফায়ে গাউসুল আ'যম আমিনে মিল্লাত গাউসে যমান হয়রত শাহসুফী সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রাহি) কে লক্ষ্য করে বজুল করিম মদাকিনী (রাহি) লিখেন,

মাইজভাণ্ডারীর দত্ত ধন করছে সদা বিতরণ
যত ছাড়ে তত বাড়ে অফুরন্ত ধন রাশি।

ধর্মগুরু কর্ম নেতা সুহৃদয় দয়াল দাতা

দর্শনে তাপিত প্রাণ আনন্দেতে যায় ভাসি।

সমাজে আনিলেন শান্তি নানী লোকের তুল দ্রাষ্টি

রচনা করিয়ে কত ধর্ম গ্রন্থ রাশি।

গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাহি) 'র খিলাফতের ধারাবাহিকতায় দানের ভাণ্ডার খুলে তাঁর অসংখ্য খলিফা ও খলিফাদের খলিফা যুগে যুগে স্থানে স্থানে বসে আছেন। যাদের পদধূলিতে ধন্য অজপাড়া গাঁ শা'আয়িরক্বাহতে রূপান্তরিত হয়েছে-হচ্ছে। গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাহি) 'র যুগবৃত্তে মানসবে বিলায়তের বিলি-বটন তাঁরই মহান সত্তা সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে বাহজাতুল আসরারে বিবৃত গাউসুল আ'যম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রাহি) 'র বাণী প্রমাণবহ। বিবৃত গাউসুল আ'যম যোগ্যতা অনুসারে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তাঁরই প্রদত্ত মহান প্রত্যেকে আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তাঁরই মহান নেয়ামত লাভ করে চলছেন। আল্লামা সৈয়দ আব্দুল গনি কাঞ্চনপুরী (রাহি) যথাধাই বলেন-

"আল্লাহ মুহাম্মদ নাম, কুট পড়িছে ভাণ্ডারে।

যার কপালে যাহা আছে, তাহা মিলে সেই ধারে।"

অনুগ্রহ প্রার্থীরা পরিপূর্ণতায় কানায় কানায় ভর্তি বরং উপচে পড়া অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছেন। মকবুলে গাউসুল আ'যমের ভাষায়-

"ধনের কাঞ্চল যারা, অশ্রু উপস্থিত তারা।

ধন পেয়েছে পেটি ভরা, খুলে পড়ি যায় বাহিরে।"

আসুন আমরাও আপন ভাগ্য বিচারিয়ে দেখতে তাঁরই মহান দ্বারে ফরিয়াদীর কাতারে দাঁড়াই। আল্লামা মকবুল কাঞ্চনপুরীর ভাষায় উদাত্ত আস্থান রইল-

"সময় বহি গেলে ধন, না মিলে সাধুগণ।

ধন কুটিতে চল যাই, সবে মিলে শীঘ্র করে।

চল মকবুল কাঞ্চলে, দেখ বিচারি কপালে।

কর সদা তওয়াক্কুল, নিরঞ্জন কুপাপরে।"



সুন্নিয়ত, তাসাওউফ ও সামাজিক জীবনে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর প্রভাব

আবুল ফজল মুহাম্মদ হাইফুজ্জাহ্ মুলতানপুরী

বিশ্ব মানবতার মুক্তির কাণ্ডারী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুক্তাবা সান্নালাহ তা'আলা আলাইহি ওয়া আ'লো আনিহী ওয়া সাল্লাম এর জাহেরি ভাবে অন্তর্ধানের পর সাহাবী, তাবেরী, তব-ই-তাবেদী, আইমায়ে আহলে বায়ত ও আইমায়ে মুজতাহেদীনদের যুগে ইসলামের যথার্থ অনুশীলন ছিল, কর্ম ও মর্মে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল মুসলমানদের জীবনব্রত। কালের বিবর্তনে কতিপয় নিঃপ্রাণ আচার-আনুষ্ঠানিকতাই ইসলাম নামে আখ্যায়িত হতে থাকে আর প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়ে নাম সর্বস্ব মুসলিম। বহু মতবাদের ধাঁধায় বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামের মর্মবাণী শান্তির পরিবর্তে পারস্পরিক বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। প্রকৃত ইসলামের ধারক শান্তিকামী সুন্নী-মুসলমান তথা সুফীয়ায়ে কেরাম হয়ে পড়েন কোন্ঠাস। এমন সংকটময় মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার মঙ্গলময় ইচ্ছানুযায়ী 'মুহীউদ্দীন' বা ধর্মের পুনর্জীবনদাতা রূপে গাউসুল আ'যম শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাাদের জিলানী (রা.) আবির্ভূত হন। তিনি আপন বেলায়তি প্রভাবে ইসলামে প্রাণের সঞ্চার করেন। তাঁরই আধ্যাত্মিক প্রভাবলোকে মুসলিম ধর্মীয় জগত পুনরুজ্জ্বল ও সজীব হয়। তিনি অনুকূল শাসন শক্তির সহায়তায় শরীয়ত মোতাবেক বিশ্ব ইসলামকে বাস্তব আধ্যাত্মিক আলোকে টেনে এনে নবজীবন দান করে সুপথগামী করেছেন।

গাউসুল আ'যম জিলানী (রা.)'র তিরোধানের প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাব্দিক বছর কাল পর, আবার মুসলিম জাহান সনাতন ইসলামিক আধ্যাত্মিক জ্ঞান, খোদায়ী প্রেরণা শক্তি ও সমায়োপযোগী মূত সঞ্জীবক সংস্কারক, শক্তিশালী হাদীয়ে কামেলরূপী সূর্যের আধ্যাত্মিক রশ্মির অভাবে পতিত হয়। ধীরে ধীরে খোদা প্রেম প্রেরণা হারা হয়ে ধর্মনীতি পালনে এবং আধ্যাত্মিকতায় অনাসক্ত ও উদাসীন হয়ে পড়ে। বিচার-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে খোদাভীতি, প্রেমপ্রীতি ভুলে আত্মচিন্তায় বিভোর হয়ে অতি সুখ, অতি বিলাস ও অতি লোভে নানা প্রকার শঠানী পস্থা অবলম্বনে লিপ্ত হয়। নামমাত্র ইসলামী শাসন গোষ্ঠীগত রাজত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়াসহ শোষণ-নির্যাতন ইত্যাদি অপকর্মের হাতিয়ারে পরিণত হয়ে কলংকিত হয়ে পড়ে। ঠিক এমন সময় ইংরেজ শাসন ও সভ্যতার প্রভাবে সমস্ত ধর্মীয় প্রভাব ও শাসনশক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে কালক্রমে ধর্মহীন নূতন রাষ্ট্রনীতির পত্তন হয়। এ সময় ধর্মীয় আত্মকাম, বাধাগ্রস্ত শরীয়ত শাসনশক্তির সহায়তা হারিয়ে অপ্রাধান্য ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং দায়িত্ব কেবল বিবেক ও সংজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের এমন এক সংকটজন মুহূর্তে আল্লাহ্ স্বীয়

মহিমায় ইসলামকে পুনর্জীবনদানকারী রূপে গাউসুল আ'যম শাহসুফী সৈয়দ আহমদুল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (রা.) কে জগতে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর বেলায়তী প্রভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারা মুসলিম জাতিতে আপন আপন বিবেক-বুদ্ধি ও সংজ্ঞানে উজ্জীবিত করে সুপথগামী করেন। তাঁর বেলায়তি প্রভাবে অসংখ্য আলি উল্যাহুর সৃষ্টি হয় এবং মাযারহু আলিদের রূহানী প্রভাবও নবরূপে জাগ্রত হয়। এতে ধর্মবিমুখ মানুষ অলিগেণের প্রতি আসক্ত হয়ে শাসন দণ্ডের ভয়ে নয় বরং বিরুদ্ধের তড়নায় প্রেম-প্রেরণায় ধার্মিক হয়ে ওঠেন। জগতের সর্বত্র প্রাণের সাড়া প্রেমের জোয়ার বইতে থাকে। সুফী কবি আরেফে কামেল আল্লামা মকবুল (রা.)'র ভাষায়, 'গাউছে ধনের প্রেম বাগানে, নিরঞ্জনের কৃপাশ্রমে; প্রেমের বসন্ত ঋতু আনিগরে'। গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র বেলায়তের সর্বব্যাপী এ প্রভাবপ্রাণ প্রভাব সকলের দৃষ্টিগোচর হবার কথা নয়। কারণ ধূলি ওড়ে সরে দেখে, বায়ু কেউ দেখে না। সুতরাং বাহ্যিকভাবে গোচরে আসে এমন

প্রভাবগুলোর কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম।
গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র শুভ দৃষ্টিতে সৃষ্ট অগণিত আলি-আল্লাহ্ সুন্নিয়ত-তাসাওউফের যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা ও সমাজ সংস্কারে ব্যাপক অবদান রাখেন। তাঁদের দরবারসমূহে এ ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত। তাছাড়া তাঁদের মাযার শরীক ঘিরে গড়ে ওঠেছে বহু শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান। তাঁদের মাযারাত লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন মসজিদ, খানকাহ, মাদরাসা, হেফযখানা, এতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি। এখানে নিম্নেট ইবাদত যেমন চলছে তেমনি জাহেরি-বাতেনি ইলমে ধীরে চর্চা-অনুশীলনও হচ্ছে। অনাথ-আশ্রয়হীন যেমন পাচ্ছেন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান তেমনি পীড়িত পাচ্ছে চিকিৎসা সেবা। তাঁদের উরস অনুষ্ঠান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসানে সম্প্রীতি স্থাপনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তাঁদের স্মৃতি ঘিরে গড়ে ওঠা সামাজিক সংগঠনগুলো সমাজ সংস্কার ও উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। স্মৃতিবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক অবদান রেখে চলছে। তাঁদের দরবারে ইসলামি সংস্কৃতির চর্চা যেমন চলছে, তেমনি ইসলামি দিবসসমূহ পালিত হচ্ছে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যতায়। ইসলামি সহিতোর পোষকতায় জোরদার লিখনী গ্রন্থাবলী ও সাময়িকী যেমন প্রকাশ হচ্ছে তেমনি সভা, সেমিনার, মিলাদ মাহফিল ও যিকির মাহফিলের মাধ্যমে হিদায়তের আলো বিতরণ করে চলছে। এক কথায় তাঁদের দরবারসমূহ সুন্নিয়তের সুবিশাল দুর্গ বিশেষ; এখানে সুন্নিয়তের লালন-পালন যেমন চলছে, তেমনি চলছে নির্ভেজাল তাসাওউফ চর্চা। এখান থেকে প্রকৃত সুন্নি-মুসলিম তথা পরিশুদ্ধ আলোকিত মানুষ সৃষ্টি হয়ে চলছে অব্যাহতভাবে। সুতরাং ওই সব সংরক্ষিত দুর্গে বাতিলের অনুপ্রবেশ না ঘটছে, না ঘটবে কসিমকালেও।
নিরোনামালোকে তথ্য ও তত্ত্ব ভিত্তিক আলোচনা সত্যিই সাধ্যাতীত। আমি এখানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.) ও তাঁর খোলাফায়ে কিরামের দরবারের

সামান্য ভাবারূপক, হোক তা এক টোক পানি, একটি ফল, এক লোকমা খাদ্য; যাই হোক না কেন, এতে কি প্রভাব রয়েছে, সেদিকে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস নেব। সম্ভাবনহীন কোন দম্পতি সর্ববিদ চেষ্টা-প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যখন এই ভাবারূপক গ্রহণ করে ওইসব অলিগণের যে কারো দ্বারস্থ হয়ে তাঁদের উসিনায় আল্লাহর দরবারে সম্মানপ্রার্থী হয়, তখন তাদের মনোবাস্তা পূর্ণ হতে দেখা যায়। তাঁদের দয়ার নজরে লব্ধ সম্ভাবন কলকমে হয়তো আরিফ-কামিল, হয়তো আলোমে রকবানী, হয়তো খ্যাতিমান আইনজ্ঞ, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ডাক্তার, বিজ্ঞানী ইত্যাদি হওয়ার প্রমাণ তাঁদের জীবনী গ্রন্থসমূহে দেখতে পাবেন ত্বরিত্ত্বি।

দুরারোগ্য ব্যাধি সারছে না, ডাক্তার-কিরাজ ব্যর্থ, সামান্য ভাবারূপক খেয়ে সুস্থ জীবন ফিরে পাচ্ছে। বিগড়ে যাওয়া সম্ভাবন লেখাপড়া, কাজ-কর্ম কিছুই করতে পারছে না, ধমক-শাস্তি কার্যকর হচ্ছে না, মা-বাবার মান সম্মান ধুলোতে মিশতে বসেছে; এমন পরিস্থিতিতে তাঁদের দরবারের ভাবারূপক জীবনধারা পাঁচটে যাওয়ার নজির পাবেন হাজার হাজার। নবোপরি সমাজ-জাতির কর্ণধার অলিউল্লাহ সৃষ্টির গাউসুল আ'যম সূচিত ধারাবাহিকতা আজও অক্ষুণ্ণ এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত অটুট থাকবে।

মোটকথা গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়ারী (রা.)'র বেলায়তি প্রভাবে কি হয়েছে, হচ্ছে, হবে; সে সমীক্ষা প্রকৃতপক্ষেই অসম্ভব। কেননা তাঁর প্রভাব আল্লাহরই কুদরত। সুতরাং আল্লাহর কুদরতে হয়নি, হচ্ছে না, হবে না; এমন কথা যেমন ভিত্তিহীন, অনুরূপ গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়ারী (রা.)'র আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার প্রভাবে হয়নি, হচ্ছে না, হবে না- এমন দাবী আল্লাহর কুদরতেরই অস্বীকৃতি। মৃতকে জীবিত করা, আজরঙ্গিল ফেরত ও আয় বৃদ্ধি করা, বাষ-সাপের মুখ থেকে উদ্ধার করা, সাগর ডুব থেকে রক্ষা করা, দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত করা, মূর্খকে আরিফে কামিলে পরিণত করা ইত্যাদির সবইতো করে দেখালেন। কেনইবা এমন হবে না, তিনি যে আল্লাহর ক্ষমতায় ক্ষমতাবান। আরিফে কামিল হযরত আল্লামা আব্দুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রা.)'র ভাষায়-

চিননিরে সাধুগণ, সে কেমন রসিকজন; প্রভুর ভাণ্ডার জান হাতেতে তাহার, এবং বাহরুল উলুম আল্লামা আব্দুল বরাকাত আব্দুল গণি কাঞ্চনপুরী (রা.)'র স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণে-

গউছে আ'যম হেঁ খলিফা কাদেরে মুখতার কা; কর দেখা সকতা হে কুদরত হে উসে হার কারকা' গাউসুল আ'যমের ঐহেন ক্ষমতার জয়ধ্বনি উচ্চারিত। এটি আরিফ-কামিলদের মুখের বুলিমাত্র নয় বরং বুখারী শরীফের ৯৬৩ পৃষ্ঠায় বিবৃত হাদীসে কুদসীর মর্মালোকে প্রতিষ্ঠিত সত্য। ওই হাদীসের মর্মালুসারে গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়ারী (রা.)'র সত্তা এমনই যে, তাঁর শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ক্ষমতা, প্রভাব ইত্যাদি আল্লাহরই কুদরত, তাঁর চাওয়া পূরণের নিশ্চয়তা ঘোষণা আল্লাহ প্রদত্তই।

শাহানুশাহে মদীনা ও শাহানুশাহে মাইজভাওয়ার-এর শাহানুশাহীর বিশেষ এক ঝলক

এস এম জাফর হাদেক আল্ আহাদী

ভূমিকাঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের জন্য এবং দুর্জদ-সালাম ও তাহিয়্যা-অভিবাদন শাহানুশাহে মদীনা, নবীকুল সরদার, আল্লাহর হাবীব, শ্রিয় নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন, শাফীউল মুয়নীবীন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও তাঁর সকল শ্রিয়জনের জন্য, বিশেষতঃ শাহানুশাহে মাইজভাওয়ার, ইমামুল আউলিয়া ওয়াত্-ত্বরীক্বত্, হযরত কিবলা-ই আলম, গাউসুল আ'যম শাহে দু'আলম সৈয়্যদ আহমাদুল্লাহ মাইজভাওয়ারী রাধিয়া আলহুত্লাম্বল বা-রী ও তদীয় খোলাফায়ে কিরাম, মাশায়িখে ত্বরীক্বাত্ সহ সকল শ্রিয়জনের জন্য নিবেদিত।

অতঃপর পরিজ্ঞাত যে, শাহানুশাহে মদীনা নবীকুল সরদার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা, জগতবাসীর জন্য মহা সৌভাগ্য রূপে এ ধরার বৃকে শুভাগমনের মহান স্মৃতিবিজড়িত ১২ রবিউল আউয়াল শরীফ পবিত্র ঈদে মীলাদুননবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবং শাহানুশাহে মাইজভাওয়ার হযরত কিবলায়ে আলম গাউসুল আ'যম শাহে দু'আলম সৈয়্যদ আহমাদুল্লাহ মাইজভাওয়ারী রাধিয়া আলহুত্লাম্বল বা-রী, জগতবাসীকে সে মহাসৌভাগ্যে পুনরুজ্জীবিত করে মহা জ্ঞাতে পাকে মিলনের শুভক্ষণ স্মারক মহান ১০ মাঘ পবিত্র উরস শরীফ মহা মর্যাদাপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। চান্দ্রবর্ষ ও সৌরবর্ষের যুগান্তর পরিভ্রমণ যোগে এবার সে মহান ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফ পবিত্র ঈদে মিলাদুননবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবং মহান ১০ মাঘ উরসে পাকে হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়ারী রাধিয়া আলহুত্লাম্বল বা-রী, দিবস দু'টি জোড় সংখ্যার গাণিতিকসূত্রে অবিকল ১০ ও ১২ তে ২৩ ও ২৫ জানুয়ারী ২০১৩ ঈসাদে পরস্পরে অলিঙ্গিত হয়ে এসে জগতবাসীর মাঝে যেন একাকারে অপরিণীম করুণাবারি বিতরণের আহবান দিয়ে যাচ্ছে; তা যেন উভয় শাহানুশাহের শান-মান-মর্যাদাগত ভিন্নতা সত্ত্বেও অভিন্ন অন্তরাত্মার এক অসাধারণ নিরবচ্ছিন্ন দীপ্তালোক।

শাহানুশাহে মদীনা (দ.)'র শাহানুশাহীঃ মহান আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চ শাহানুশাহীর পর চির অভুলনীয় ও শ্রেষ্ঠতর শাহানুশাহীর মালিক তো, শাহানুশাহে মদীনা নবীবার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামা। কুরআন-হাদীসের বর্ণনালোকে তাঁর শাহানশাহীর কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নরূপ।

এক. “তাঁর নূরী সত্তা আল্লাহ তা‘আলার নূর থেকেই সর্বপ্রথম সৃজিত এবং তা’ থেকে অন্যান্য সৃষ্টির সৃজন” মর্মে অনুভূত যে, এদিকে তাঁর নূরী সত্তার পর্যায়ক্রমিক বিস্তৃতি সমগ্র সৃজন ব্যাপী, ওই দিকে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্যের মূল কেন্দ্রে অবস্থিত। এতেকরে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা‘আলা এবং সমুদয় সৃষ্টির মধ্যকার যাবতীয় চাওয়া-পাওয়ার প্রধান মাধ্যম বা মূল কেন্দ্রই তাঁর নূরী সত্তা বলে প্রতীয়মান হয়।

দুই. “রাহমাতুল্লিল ‘আলামীন” মর্মে সমগ্র সৃষ্টি জগত তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হয়।

তিন. আল্লাহর দান বটনকারীও তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেই বিধোষিত।

চার. জগতের সমুদয় ভাঙারের চাবি তাঁর পবিত্র হাতে বলে বিধোষিত।

পাঁচ. দানশীলতায় তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এমনই এক শাহানশাহ, যার সমীপে চাইলে সৃষ্টির সবইতো বটে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা‘আলাকেও পাওয়া যায়।

ছয়. সৃষ্টির সেরা মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাশালী আশিয়া-ই কিব্রামেরও উর্ধ্বে তাঁর মহা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান।

সাত. “মুস্তাফা” মর্মেও সৃষ্টিকুলের সর্বোপরি আল্লাহর মনোনীত সত্তা হন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

আট. আল্লাহ তা‘আলার মাহবুব-হাবীব তথা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা তাঁর সন্তোষকামী মর্মে, তাঁর শাহানশাহীর বর্ণনাতীত অপরিসীমতা সমগ্র সৃষ্টি নতালিরে মানতে বাধ্য।

নয়. কিয়ামত দিবসে তাঁর লিওয়াউল হামদ বা প্রশংসার পতাকা তলে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল নবী আলাইহিস্ সালাম স্বদলে আশ্রিত হবেন।

দশ. কঠিন কিয়ামত দিবসে সর্বাত্মক সফল সুপারিশ বা শাফা‘আতের সূচনাকারী হবেন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবং সেদিনও উম্মাতের কাঙারী

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হাউয়ে কাউছারে, মিয়ানে, পুলসিরাতে এবং জাহান্নামের দ্বারদেশে উদ্ধারকর্তারূপে উপস্থিত থাকবেন।

এগার. তাঁর মর্জি মোতাবেক “ভূবিত সূর্যের তৎক্ষণাৎ পুনঃউদয়”, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, আবু জাহলের মুষ্টিবদ্ধ কঙ্কর কর্তৃক তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য দিয়ে কলিমা পাঠ, গাছ-বৃক্ষকে ডাকলে খিদমতে চলে আসা, মত্ত উটের সিঁজদাহ করা, হরিণীর ফরিয়াদী হওয়া, স্পর্শধন্য শুকনো কাঠের শুভ্র বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মতো জীবন্ত হয়ে বিরহে ক্রন্দন করতে থাকলে সাপ্তান্য দানে শান্ত হওয়া প্রভৃতি অসংখ্য মু‘জিযা সৃজন ব্যাপী তাঁর শাহানশাহীর নিদর্শন।

বার. তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা কাকিরদের লক্ষ্য করে বালি নিক্ষেপ করাকে আল্লাহর নিক্ষেপণ, তাঁর নিকট বাই‘আত গ্রহণকে আল্লাহর নিকট বাই‘আত গ্রহণ, তাঁর পবিত্র হস্ত মোবারককে আল্লাহর হাত বলে ঘোষণা দান, তাঁর আহবানকে আল্লাহর আহবান, ফরমানকে আল্লাহর ফরমান এবং আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য বলে ঘোষণা ইত্যাদি মর্মে তাঁর অতুলনীয় শাহানশাহীর আদ্যন্ত বিবরণ সৃষ্টির পক্ষে কোন কালেই সম্ভব নয়।

উক্ত শাহানশাহীর পর্যায়ক্রমিক বিকাশঃ উপরোক্ত ১২টি সূত্রাবলী থেকে প্রথমটির আদিকে অবগত যে, শাহানশাহে মদীনার নূরী সত্তার পর্যায়ক্রমিক বিস্তৃতি সমগ্র সৃজন ব্যাপী। এতেকরে মানবজাতির পিতা তথা প্রথম মানব হযরত আদম খলীকতুল্লাহ আলাইহিস্ সালামের সৃজনকালে তাঁর মোবারক সত্তায় উক্ত নূরী সত্তার অবস্থান অনস্বীকার্য সত্য। হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃজনের পর সর্ব সাধারণ থেকে আল্লাহর রবুবিয়্যাত বা পালন কর্তৃত্বের এবং নবীগণ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ‘রিসালত’ মেনে নেওয়ার যথাক্রমিক স্বীকারোক্তি ও দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ মর্মীয় ‘আয়াতে কুরআন’ দ্বারাও ঐহেন অবস্থানের সত্যতা প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের মোবারক ললাটে উক্ত নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার অবস্থান বদৌলতেই তিনি খলীফাতুল্লাহরূপী শাহানশাহীর মসনদে সমাসীন হন। হাদীসে কুদসী- كُنْتُ خَلِيفَةَ مُحَمَّدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (লাও লা-মুহাম্মাদুন মা-খালীফতুকা ওয়া মা গাফারতুকা) অর্থাৎ ‘মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা না হলে ক্ষমা তো দূরের, তোমাকে সৃষ্টিও করতাম না’ মর্মেও প্রমাণিত যে, তাঁর শাহানশাহী আপন সত্তাগত নয়, নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সত্তার বদৌলতেই। অতএব হযরত আদম খলীফাতুল্লাহু আলাইহিস্ সালামের অবয়বে দীপ্যমান শাহানশাহী মূলতঃ শাহানশাহে মদীনার শাহানশাহীরই দীপ্তি।

অনুরূপ শীশ, নূর, ইব্রাহীম আল্লাহিহিস্ সালাম থেকে ঈসা রুহুল্লাহ আল্লাহিস্ সালাম পর্যন্ত সকল নবী-রাসুল আল্লাহিহিস্ সালাম'র অবয়বে, তৎসম্পর্কিত কখনো অভিলিখ্য রূপেও উক্ত শাহানশাহীর দীপ্তলোক বিকিরণগোত্র নবুয়ত যুগবৃণ্ডের অবসান কালে পরিপূর্ণ অবয়বে শাহানশাহে মদিনা নবীকুল সরদার, সর্বশেষ নবী, পরম প্রশংসিত সত্তা, আকু-মাওলা মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আপন মহিমায় গুণগমন করেন।

অতঃপর বিলায়ত ধারায় তাঁর নূরী সত্তার শাহানশাহী-বিকাশ অব্যাহত থাকে। তাই তো, শাহানশাহে বিলায়ত মাওলা আলী মুশকিল কোশা কারারামুল্লাহ ওয়াজ্জহু'র পবিত্র সত্তার পরিচয় দিয়ে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

(এক). - ^{وَأَنَا مَعِي} (ইল্লা আলী-য়াম্ মিল্লী- ওয়া আনা-মিনহু) অর্থাৎ নিচয় আলী আমা থেকে এবং আমি তাঁর থেকে হই (তিরমযী; মিশকাত: ৫৬৪ পৃষ্ঠা)।

(দুই). - ^{مِنْ كُنْزِ مَوْلَانِي} (মান কুনুতু মাওলা-হ ফা আলীয়্যাম্ মাওলা-হ) অর্থাৎ আমি যার মনিব হই, আলীও তার মনিব (মুসনাদে ইমাম আহমদ; তিরমযী; মিশকাত: ৫৬৪ পৃষ্ঠা)।

(তিন).

^{مَنْ نَبَى الْأَمِيرَ نَبَى إِلَى الْأَمِيرِ} (মাসু'ন নবী-ইল্লা-লাহু নায়ীরুন্ ফী-উম্মাতী; ফা আবু বাকরিন্ নায়ীক

ইব্রাহীমা ওয়া ওমারু নায়ীকু মুসা- ওয়া 'ওসমানু নায়ীকু হারুন) ওয়া আলীয়্যান্ নায়ী-রী-) অর্থাৎ প্রত্যেক নবীরই সাদৃশ্য সত্তা আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান। অতএব আবু বাকর ইব্রাহীমেরই সাদৃশ্য, ওমর মুসার সাদৃশ্য, ওসমান হারুনেরই সাদৃশ্য এবং আলী আমারই সাদৃশ্য (আল খসায়েসুল কুবার)।

অনুরূপ সাযিদুনা ইমাম হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিচয়ে ইরশাদ হচ্ছে-

^{حُسَيْنٌ مِّنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ} (হুসাইনুন্ মিল্লী- ওয়া আনা-মিন হুসাইনিন্) অর্থাৎ (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন) হুসাইন আমা থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে হই (তিরমযী; মিশকাত- ৫৭১ পৃষ্ঠা)।

উপরোক্ত দলিলাদি দ্বারা- প্রথমত: আযিম্মা-ই আহল-ই বাইতের উল্লেখিত দু'মহান সত্তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আপন সত্তা থেকে অভিন্ন বলেইতো বুঝা যায়। দ্বিতীয়ত: 'আমি আলী থেকে কিংবা আমি হুসাইন

থেকে হই' বানী মার্মে- তাঁদের থেকে ওই নূরী সত্তার পর্যায়ক্রমিক বিকাশ অব্যাহত ধারায় চলমান বুঝা যায়। আর এ ধারাবাহিকতার হযরত আলী (রাযি.) থেকে ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এবং হুসাইন (রাযি.) থেকে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন রাযিয়াল্লাহু আনহুর সত্তা হয়ে হযরত ইমাম হাসান আসকারী রাযিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত সকল আযিম্মায়ে আহলে বাইতের সত্তার ব্যাপারে অনেকেই অবগত। শাহানশাহে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র ভবিষ্যদ্বাণীকৃত হযরত ইমাম মাহদী আল্লাহিস্ সালাম'র মতো অনুরূপ নূরী সত্তার ব্যাপারেও অনেকের পরিচয় ধারণা রয়েছে যে, তিনি ভবিষ্যতে আগচ্ছমান। এতদসত্ত্বে 'কুতুবিয়্যাত-এ কুবরা বা গাউসিয়্যাত-এ কুবরা'য় অধিষ্ঠিত সত্তা মাত্রই উক্তরূপ নূরী সত্তা হওয়ার পরিচিতি যুগযুগ ধরেই বিধৃত দেখা যায়। যেমন- শাহানশাহে বাগদাদ হযরত গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাযিয়াল্লাহু আনহু (৪৭০-৫৬১ হিজরী) আপন সত্তার পরিচয়ে ইরশাদ করেন- ^{وَسِرْتُ فِي الْمَلَأِ بِرُوحِ مُحَمَّدٍ + لَكَ بَسْرُ اللَّهِ قُلْ لِسِرِّ}

(ওয়া সিরুরী ফীল 'উলীইয়্যা বিনু-রি মুহাম্মদ + ফাকুন্ন- বিসিরুল্লাহি কুবলান্ নাবয়্যাত) অর্থাৎ আমার রহস্যময় সত্তা নূরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র সাথে সম্মান উচ্চে অবস্থিত; অতএব নবুয়ত পূর্বে আল্লাহর রহস্যে আমরা ছিলাম (মায়হারে জমালে মুত্তাফায়ী-১২১ পৃষ্ঠা)।

উপরোক্ত দলিলাদির ভিত্তি অনুবলে 'কুতুবিয়্যাত তথা গাউসিয়্যাত-এ কুবরা'র সংজ্ঞায় সাইয়দুনা হযরত সাইয়্যাদ শরীফ জুরজানী হানফী রাযিয়াল্লাহু আনহু (৭৪০-৮১৬ হিজরী) সুন্দরই বলেছেন-

^{الْفُطْيَةُ الْكِبْرَى مِمَّنْ مَرَّبَتْهُ فُطْبُ الْإِطْبَابِ وَطُرُ بَاطِنُ نَبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَكُونُ إِلَّا لَوْرَثِهِ}

(আল কুতুবিয়্যাতুল কুবরা-হিয়া মারতবাতু কুতুবিল আকুত্ব-বি ওয়া হুয়া বা- তিনু নবু-ওয়্যাতি মুহাম্মাদিন্ আল্লাহিস্ সালাম; ফালা-ইয়াকু-ন্ ইল্লা লিওয়রাছাত্হী লিইখতিছা-ছিহী বিন আক্ফালিইয়্যাতি) অর্থাৎ 'কুতুবিয়্যাত-এ কুবরা' হল কুতুবুল আকুত্বেরই বিশেষ মরতবা বা এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এমতাবস্থায় তিনি হল 'নবুয়্যতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র গোপন অংশ; যা একমাত্র তাঁর ওয়ারিশ হওয়া ব্যতীত হবার নয়। কারণ হুজুত পরিপূর্ণতায় পৌছানো তাঁরই সাথে নির্দিষ্ট (আত্ভা'রীফাত-১২৫ পৃষ্ঠা)।

অতএব উক্তরূপ ধারাবাহিকতার এ পর্যায়ে বর্তমানে চলতে থাকা যুগবৃণ্ডের জন্য 'গাউসিয়্যাত-এ কুবরা'র বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান সত্তা শাহানশাহে মাইজভাতারের শাহানশাহীর কিঞ্চে বিবরণ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হিসেবে নিম্নে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

দুশ্যমান সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ চাইলে যেমন তৎপ্রতি একটুখানি তাকানোই যথেষ্ট, তেমনি শাহান্শাহে মাইজভাণ্ডার ইমামুল আউলিয়া ওয়াত্তুরীফত হযরত ক্বিবলায়ে আলাম গাউসুল আ'যম শাহে দু'আলাম নৈয়্যাদ আহমাদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী রাধিয়া আনুহুত্তাল বা-রী'র শাহান্শাহী দীপ্তালোকের প্রতি টুকু চেয়ে দেখাই যথেষ্ট। এতদসত্ত্বে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অসংখ্য আউলিয়া-ই কামেলীন-মুকামেলীনের দিগদর্শন তো রয়েছেই। কিন্তু সূর্যের বর্ণনাভীতি বিশালতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ যেমন সম্ভব নয়, এখানেও তাই। অতএব তাঁর দেদীপ্যমান শাহান্শাহীর কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নরূপ।

এক. বিশিষ্টজন থেকে সাধারণ সর্বস্তরে পরিচিতিমূলক তাঁর অসংখ্য কার্যমতাবলীর প্রভাব এমনই যে, তিনি একজন অতি উচ্চ মানের মহান ওলীমুল্লাহ বলে প্রত্যেকেই স্বীকার ও মান্য করেন। জগতকূলে যথার্থরূপে স্বীকৃত অনধিক দুই গাউসুল আ'যম'র একজন তিনি হিসেবেও যথার্থ স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। তিনি গাউসিয়্যতে কুবরায় অধিষ্ঠিত হওয়াও সুপ্রমাণিত।

দুই. তাঁর কার্যমতের অংশ বিশেষ- (১) মৃত দেহে পুনরায় প্রাণের সংগর (২) মৃত্যুকালে আজরাইল ফেরত এবং আযুব্বি (৩) লাঠির আঘাতে খালের গতি পরিবর্তন (৪) সূর্য উদিত হওয়ার এবং লোকজনের চলাচল শুরু হওয়ার উপক্রম অবস্থায় পর্দাশীলা ভক্ত মহিলাকে দেড়/দুই ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে কেউ না দেখে মতো বাড়ি পৌঁছতে হবে এমন আরেদনের প্রেক্ষিতে সূর্যোদয় ও লোক চলাচল ধামিয়ে রাখা (৫) বৃষ্টি চাইলে বৃষ্টি দান (৬) নিষ্ফলা বৃক্ষে ফল দান (৭) বন্যজন্তু এবং কীটপতঙ্গ থেকে ফসল রক্ষা (৮) বেলায়িত ক্ষমতায় সন্তান দান (৯) অস্ত্র খাদ্যে অনেক লোকের আপ্যায়ন (১০) অস্ত্র দ্রব্য অসংখ্য লোকের মধ্যে বন্টন (১১) মাইজভাণ্ডার শরীফে অবস্থান করা সত্ত্বেও মস্কা-মদিনা শরীফে সাক্ষাত লাভ এবং তথায় বিপদগ্রস্ত এক হাজিকে একরাতে চটুগ্রামে প্রেরণ করা, ঘটনাক্রমাত্তরে অন্য হাজিকে হাতে ধরে অস্ত্রক্ষণের মধ্যে তার বাড়ীর সামনে এনে দেওয়া (১২) বিপরীত দ্রব্য, সাধারণ দ্রব্য, পানি, তাবারক্ক, এমন কি জুতা মোবারকের ধূনার বদৌলতেও বহুজনের দূরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি (১৩) সাগরদুর্বিতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার (১৪) ভুবত্ত ষ্টিমারকে নিরাপদে উদ্ধার (১৫) অলৌকিকভাবে বাঘের মুখে লোটা নিষ্ক্ষেপে ভক্ত উদ্ধার (১৬) বাঘের হঠাৎ আক্রমণ থেকে ভক্ত উদ্ধারে অলৌকিক উপস্থিতি (১৭) বাঘের আনুগত্য প্রকাশ (১৮) নানা বিপদে আপদে উদ্ধার ও দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি ইত্যাদি অসংখ্য কার্যমতাবলী জগত ব্যাপী যে কোন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে সক্ষমতার নিদর্শন।

তিন. তাঁর অসংখ্য কার্যমতের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ অংশ হলো- আধ্যাত্মিক কৃপাদৃষ্টি যোগে কিংবা তাবারক্ক প্রদান পূর্বক কিংবা ব্যক্তি বিশেষ নির্দিষ্টত ঈযৎ নফল ইবাদত ইত্যাদি দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন বাদশাহ রূপী অসংখ্য ওলীয়ে কামিল-মুকামিলের সৃষ্টি হওয়া এবং ধারাবাহিক সৃষ্টি হতে থাকা পরিলক্ষিত হওয়া।

চার. তাঁর খলীফাহ, মুরিদ, একনিষ্ঠ ভক্ত কিংবা ত্বরীকাভুক্ত বহুজনের লাশ মোবারক ইত্তিকালের কয়েক বছর কিংবা কয়েক যুগ পরও কুবরার অবিকল অবস্থায় আবিষ্কৃত হওয়া, তাঁর চির সমুজ্জ্বল শাহান্শাহীর এক দেদীপ্যমান নিদর্শন।

পাঁচ. শাহান্শাহে বাগদাদ হযরত গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাধিয়াল্লাহু আনহু'র জীবনী গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ জীবনীগ্রন্থ 'বাহজাতুল আসরার ওয়া মা'দিনুল আনওয়ার' প্রকাশনায় বাইরুত, লেবনান ৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত দিগদর্শন মর্মে- 'নামধাম উল্লেখ করা না হলেও নিজ সমকক্ষ বন্ধু আধ্যায়িত করতঃ যেকোন বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করে গেছেন, সে সূত্রের বাস্তবরূপই শাহান্শাহে মাইজভাণ্ডার হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাধিয়া আনুহুত্তাল বা-রী'র স্বতন্ত্র 'গাউসুল আ'যমিয়্যত এবং গাউসিয়্যাত- এ কুবরা।' বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য 'গাউসুল আ'যম অভিধা' দ্রষ্টব্য।

ছয়. অন্য কোন ওলীমুল্লাহর সাথে তুলনা করে শাহান্শাহে মাইজভাণ্ডারের শান-মান-মর্যাদা বুঝতে চাইলে অনধিক দুই গাউসুল আ'যম'র অপর সত্তা শাহান্শাহে বাগদাদের সাথেই একমাত্র তুলনা করা চলে। তাইতো শাহান্শাহে বাগদাদের ইরশাদ সূত্রে- তাঁকে কারো সাথে এবং কাউকে তাঁর সাথে তুলনা করতে নিষেধ করায় (বাহজাতুল আসরার-৫২ পৃষ্ঠা) যেমন নিজ সমকক্ষ বন্ধুটি ছাড়া কেউ তাঁর তুল্য হতে পারেনা, অনুরূপ শাহান্শাহে মাইজভাণ্ডারের ইরশাদ হচ্ছে- ১. 'আমার নাম পীরানপীর সাহেবের নামের সাথে সোনালী অক্ষরে লিখা আছে' (বেলায়তে মোতলাকা-১০৫ পৃষ্ঠা)। ২. 'রাহুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হস্ত মোবারকে দু'টি তাজ (বর্ণনাগত্রে টুপী) ছিল; একটি তাজ আমার মাথায় পরিয়ে দেন, অপরটি আমার ভাই পীরানপীর শায়খ আবদুল কাদির জীলানী সাহেবের মাথায় পরানো হয়।' ৩. আমি একদিন আমার ভাই পীরানপীর সাহেবের সহিত কাবা শরীফ টুকিয়া দেখিতে পাইলাম রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার 'ছদর' মোবারক (ছিনা) এক অসীম দরিয়া, আমরা উভয়ে উহাতে ডুব দিলাম' (জীবনী ও কেরামত ২০০ পৃষ্ঠা)।

তাছাড়া অপরিচীত কাশফ-কারামাতের অধিকারী কুতুবে যমান কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার প্রধান মাওলানা হযরতুলহাজ্জ আল্লামা শাহসুফী সফী উল্লাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আল্লাহিহির'র অভিমতও এখানে প্রনিধান যোগ্য। শাহানশাহে মাইজভাঙার'র শানে তাঁর উক্তি-“হযরত বৎসরের মধ্যে তাঁহার মত এইরূপ অলি আল্লাহ পৃথিবীতে আসেন নাই,” (জীবনী ও কেরামত গ্রন্থ- ৯২ পৃষ্ঠা)। উল্লেখ্য যে, হযরত বহরর মধ্যে না আসা মর্মে-হযরতাদিক বহরকাল পূর্বে আগমিত তাঁর সাথে তুল্য সত্তা হযরত গাউসুল আ'যম শাহানশাহে বাগদাদই বলে প্রতীয়মান হয়।

সাত. বাহজাতুল আসরার ৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত শাহানশাহে বাগদাদের দিগদর্শন মর্মে আরো স্পষ্ট যে, তাঁর সমকক্ষ বহুটির নিয়ন্ত্রণে নিজ যমানাবাসীর সমুদয় কার্যবলী সোপর্দি, যাকে ইচ্ছা নিজ মর্জি মার্কিক দান ও বঞ্চিত করার ক্ষমতা প্রদত্ত, আল্লাহর জমিন ও জগতসমূহে বলীফাহ রূপে আবর্তিত এবং নিজ সময়কালে আপন বাদশাহীর জিম্মা প্রাপ্ত ইত্যাদি। তাইতো শাহানশাহে মাইজভাঙার আপন মর্জি মার্কিক অসংখ্য ওলীমুল্লাহ সৃষ্টি করা সহ অপরিচীত দানে জগতবাসীকে ধন্যও করেছে, আবার কারো বেয়াদবী হেতু বিলায়ত স্থিনিয়ে নেওয়া সহ নাশা বঞ্চনার শাস্তিও দিয়েছেন (জীবনী ও কেরামত; আঙ্গিনায়ে বারী দ্রষ্টব্য)। আর বলাই বাহুল্য যে, এখানে শাহানশাহে বাগদাদের বিলায়তের নিয়ন্ত্রণাধীন যুগবত্তের অবসান এবং শাহানশাহে মাইজভাঙারের বিলায়তের নিয়ন্ত্রণাধীন যুগবৃত্ত সৃষ্টি হতে চলমান প্রতিভাত হয়। এ যুগবত্তের শেষ সীমা সম্বন্ধীয় আলোচনা অচিরেই বিবৃত হবে, তৎপূর্বে শাহানশাহে মাইজভাঙার'র ‘গাউছিয়াতে কুবরা’ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা যাক।

অট. শাহানশাহে মাইজভাঙার'র গাউসিয়াতে কুবরা, শাহানশাহে বাগদাদের সমকক্ষতা মর্মেও প্রতিভাত হয়। কেননা শাহানশাহে বাগদাদ যেমন গাউসিয়াতে কুবরার অধিকারী হন, অনুরূপ তিনিও হন বলেইতো পরস্পর সমকক্ষ হন। পক্ষান্তরে তিনি রাধিয়া আনছুল্লাহুল বা-রী যে, গাউসিয়াতে কুবরার অধিকারী তথা বাত্বিনে নবুয়তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বিশেষত্বের বৈশিষ্ট্যধারী হন সে পরিচিতি মূলক বিবৃতি তিনি নিজেও দিয়েছেন।

যেমন-

১. ধুরঙ্গ খালের গতি পরিবর্তন সম্পৃক্ত কারামতটির ঘটনা প্রবাহে-তাঁর সাথে বেয়াদবী করাকে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে বেয়াদবী আখ্যা দিয়ে এলাকাবাসীর পক্ষে শাহসুফী আবদুল মজিদ মিঞার কাতর আবেদনের উত্তরে ইরশাদ করেন- ‘হারামজাদী রহুল করিম (দ.) এর

সহিত বেয়াদবী করিয়াছে, কেন আবার ফিরিয়া আসিবে?’ (জীবনী ও কেরামত)।

২. একদিন হযরতের ভ্রাতৃপুত্র জৈয়দ নোহাম্মদ হাসেম ছাহেব ভোর বেলায় জৈয়দ মীর হাছান (হযরতের পৌত্র) ছাহেবকে নিদ্রা হইতে একটু কর্কশ ভাষায় ডাকিয়া উঠাইতে শুনিয়া হযরত বলিলেন, “মিঞা! রহুল্লাহুর (দ.) দুইজন নাতী হাছানহিনকে চিন না? (হযরত হাছান ও হোছাইন) আদরের মোকাম, আদব করিও।” (প্রাণ্ডক: ১৯৮ পৃষ্ঠা)।

এমত আরো বিবৃতি রয়েছে, যদ্বারা প্রতিভাত হয় যে, শাহানশাহে মাইজভাঙার হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাঙারী রাধিয়া আনছুল্লাহুল বা-রী'র সত্তা, নবুয়তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একটি গোপন রূপই তথা গাউসিয়াতে কুবরার বৈশিষ্ট্যধারী মহান এক সত্তা হন।

নয়. আর তিনি যে, উক্তরূপ মহান এক সত্তা হন, তৎপক্ষে স্বীকৃতি মূলক বহু উদ্ধৃতিও উপস্থাপন করা যায়। যেমন-

১. মুহাব্বিকে লা-ছান (বিরল তত্ত্বজ্ঞানী) গাউসে যমান, শায়খুল ইসলাম মুফতিয়ে আ'যম আল্লামা আমীনুল হক ফাযিলে ফরহাদাবাদী কুদ্দিসা সিরক্বহ প্রণীত তোহফাতুল আখইয়ার ফতোয়া গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর শানে- সাইয়্যাদুল কাউনদীন (দু'জগতের সর্দার), রাহমাতুল্লাহুল আলামীন (জগতকুলের জন্য রহমত) ইত্যাদি শব্দাবলী যোগে বর্ণিত শান মর্মে তিনি নবুয়তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার একটি গোপনরূপ তথা গাউসিয়াতে কুবরার বৈশিষ্ট্যধারী হওয়ার কথা ফুটে উঠে। এক্ষেত্রে অন্যান্য যুগস্থ একইরূপ কিংবা ততোধিক মর্যাদাবানদের শান-মান-মর্যাদা দৃষ্টে যাতে প্রত্নের অবকাশ না থাকে এমন বিবেচনায় তিনি ‘কি হায্য যমান তথা এ যুগে’ উক্তি দ্বারা শর্তারোপও করেছেন।

এভাবে শাহানশাহে মাইজভাঙার হযরত কুবরার শান বর্ণনাকারী ফাযিলে ফরহাদাবাদী কুদ্দিসা সিরক্বহর মর্যাদাপূর্ণ সত্তার দিকে দৃষ্টি দিলে আরেক্ষীন-কামেলীন-মু'কামেলীন'র অনুসারীদের জন্য তো বটেই, আহলে সুন্নাতের সাধারণ অনুসারীদের জন্যও তা গ্রহণীয় দলিল। কেননা, ইমামে আহলে সুন্নাত গাযীয়ে দ্বীনোমিন্নাত আল্লামা আযীযুল হক শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আল্লাইহি র প্রশংসার ভাষায় ফাযিলে ফরহাদাবাদী কুদ্দিসা সিরক্বহ হলেন-

“বিশেষতঃ আলিমদের পথের দিশারী, জ্ঞানীগণীদের অনুসৃত সত্তা, পরবর্তীদের

দলিল, পূর্ববর্তীদের অন্তর্ভুক্ত এক সত্তা, সুন্নীদের জন্য মহান নি'আমত, ওহাবীদের জন্য প্রাণ সংহারক বিষ, সুন্নীদের জন্য লাল গন্ধক বা পরশমণির মূল, ওহাবীদের জন্য ফিরআউন যুগের হযরত মুসা স্বরূপ, সুন্নীদের যুগশ্রেষ্ঠ-প্রধান ভিত্তি স্তম্ভ, জ্ঞানীশুণীদের ইমাম, আরিফগণের গর্বমুকুট, বিশ্বজগতের বিরল তত্ত্বজ্ঞানী এবং আহলে সুন্নাতের বাগানের এমনই এক ফুল-সম্ভার, যার সুগন্ধিতে সমস্ত জগত মাতোয়ারা ইত্যাদি" (আরো অধিক ও বিস্তারিত জানতে দিওয়ানে আযীয দ্রষ্টব্য)।

২. বাহুরুল 'উলুম বা জ্ঞান সাগর বলে খ্যাত আল্লামা, পরীক্ষিত কণ্ঠক কারামাতের অধিকারী বিশিষ্ট ওলী ও আরিফে কামিল, হযরত শাহসুফী মাওলা সৈয়্যদ আবুল বারাকাত মুহাম্মদ আবদুল গনী কাঞ্চনপুরী ইসলামাবাদী হানফী ফায়েদারী কুদ্দিসা সিরুসুহ প্রণীত আদ্বিনায়ে বা-রী কিতাবের অন্তর্গত "খা-বে আসরার মাআ-ব বিলাদতে হযরত গাউসে পাক রাখিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু" শীর্ষক বর্ণনাক্রমে- যুগে যুগে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আবির্ভাব ধারাবাহিকতায় এক সমুজ্জল সত্তা বলেই আখ্যা দিয়েছেন, শাহানুশাহে মাইজভাণ্ডার হযরত গাউসে পাক, হাবীবে ছাহিবে লাউলা-ক, সুলতানে সালাত্বী-নে 'আ-রিফীন, রূহে রওয়ানে মুক্বাররবীন, খলীফাতুল্লাহিল আকরাম, যিল্লুল্লাহি ফিল'আ-লম, গাউসুল্লাহিল আ'যম সৈয়্যদ আহমাদুল্লাহ তা'আলা মাইজভাণ্ডারী রাখিয়া আনহুল্লাহু বা-রী'র মহান সত্তাকে।

৩. পক্ষান্তরে শাহানুশাহে মাইজভাণ্ডার'র গাউসিয়্যতে কুবরার প্রামাণ্য উক্তরূপ বহু উদ্ধৃতি তুলে ধরা যায়, তবে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে বিরক্তিকর ঠেকার আশংকায় আর বেশী অগ্রসর না হয়ে একটি স্বপ্নতত্ত্বে স্বপ্নাবিষ্ট হই। জনাব মৌঃ আবদুস সানাম ইছাপুরী স্বপ্নে দেখলেন- "মাইজভাণ্ডার শরীফ লোককে লোকারণ্য। সবাই বলাবলি করেছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবং গাউসুল আ'যম পীরান-পীর দস্তগীর রাখিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মাইজভাণ্ডার শরীফ তশরীফ এনেছেন। অসংখ্য লোকের ভিড় ঠেলে তিনিও দেখতে গেলেন। দেখলেন, সবাই যাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলে জ্ঞান করছেন, তিনি হযরত কিবলায়ে আলম মাইজভাণ্ডারী রাখিয়া আনহুল্লাহু বা-রী আর যাকে গাউসুল আ'যম দস্তগীর রাখিয়াল্লাহু আনহু জ্ঞান করছেন তিনি বাবা ভাণ্ডারী রাখিয়া আনহুল্লাহু বা-রী।"

স্বপ্নটির যা' তা'বীর বা ব্যাখ্যা তিনি করলেন বা বুঝলেন, সেটা তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। অনুকূপ অন্যরা কি বুঝলেন বা বুঝবেন সেটাও তাদের নিজস্ব ব্যাপার। তবে স্বপ্নে দৃষ্ট রূপভিন্নতা হেতু উভয়ের ক্ষেত্রে অভিধা-উপাধির

অপরিহার্য ভিন্নতাও প্রত্যেকের বুঝে ভ্রষ্টা উচিত বিধায় আমার বুঝটা বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ সমীপে তুলে ধরাছি, যাতে গঠনমূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে যথার্থ ব্যাখ্যায় উপনীত হতে পারি।

ব্যাখ্যা- এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলে জ্ঞানকৃত দৃশ্যমান হযরত কিবলাকে শাহানুশাহে মদীনার মত প্রকাশ্য 'গাউসুল আ'যম' অভিধায় আখ্যায়িত করা যাবে না; বরং তিনি ভিন্ন নাম ও অভিধায় প্রকাশিত ও আখ্যায়িত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নব্যুত্তের একটি গোপন রূপ; অতএব তিনি অন্যধিক দুয়ের এক গাউসুল আ'যম এবং অনন্যসাধারণ কুতুবুল আক্বতাব অভিধায় বিভূষিত হওয়াই যথার্থ।

আর গাউসুল আ'যম দস্তগীর রাখিয়াল্লাহু আনহু বলে জ্ঞানকৃত দৃশ্যমান বাবা ভাণ্ডারীকে গাউসুল আ'যম দস্তগীরের মত প্রকাশ্য 'গাউসুল আ'যম' অভিধায় আখ্যায়িত করা যাবে না; বরং তিনি ভিন্ন নাম ও অভিধায় প্রকাশিত ও আখ্যায়িত গাউসুল আ'যম দস্তগীরের গাউসিয়্যতের একটি গোপন রূপ; অতএব তিনি সাধারণতঃ গাউসে যমান ও কুতুবুল আক্বতাবে যমান পদবী-অভিধায় বিভূষিত হওয়াই যথার্থ।

ব্যাখ্যা শেষে স্বপ্নটির স্বপ্নাবেশ সহ মূল আলোচনায় অগ্রসর হই। মূলতঃ এ স্বপ্নটি মর্মেও শাহানুশাহে মাইজভাণ্ডারের গাউসিয়্যতে কুবরা প্রতিভাত হয়; যা শাহানুশাহে মাইজভাণ্ডার হযরত কিবলায়ে আলম, গাউসুল আ'যম, শাহে দু'আলম সৈয়্যদ আহমাদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী রাখিয়া আনহুল্লাহু বা-রীকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হিসেবে দেখতে পাওয়া মর্মে সুস্পষ্ট। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, শাহানুশাহে মাইজভাণ্ডার'র আবির্ভাব কাল থেকে শুরু করে গাউসিয়্যত বা কুতুবিয়্যত-এ কুবরার বৈশিষ্ট্যধারী অপর কোন সত্তার আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র সৃজন ব্যাপী তাঁরই বিলায়তের কর্তৃত্ব চলতে থাকবে; কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নব্যুত্তেরই একটি গোপন রূপ হিসেবে এ যুগবৃত্তে তিনিই ক্ষমতাসীন। আর এ যুগবৃত্তের প্রান্তিক আলোচনা নিম্নে বিবৃত।

দশ. শাহানুশাহে মাইজভাণ্ডারের বেলায়তের নিয়ন্ত্রণাধীন চলমান যুগবৃত্তের প্রান্তিক আলোচনায় সার কথা হল- হযরত ইমাম খলীফাতুল্লাহ আল মাহদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত এ যুগবৃত্ত চলতেই থাকবে। কারণ এ যুগবৃত্তের অবসান ঘটাতে গেলে গাউসুল আ'যমের আরেকজন সমকক্ষ কিংবা তদুচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী সত্তার আবশ্যক; অন্যথায় নয়।

কেননা গাউসুল আ'যম হন, যাঁধিকারে দান ও বিপ্লবিত করার ক্ষমতা এবং বাঁহুনে নবুয়াতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হওয়ার মর্যাদা প্রাপ্ত (প্রাপ্ত)। আর উক্ত ক্ষমতা ও মর্যাদার পূর্ণ পরিবর্তন, হয়তো অনুকূপ আরেক সত্তায় রূপান্তরের মাধ্যমে হবে কিংবা রহিত করণের মাধ্যমে হবে। তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ রহিতকরণ বোলায়তের ক্ষেত্রে বিধিত নয়। আর প্রথমটি তথা রূপান্তরের মাধ্যমে হলে একইরূপ ক্ষমতা ও মর্যাদার রূপান্তর হেতু কমপক্ষে হলেও তা' পরস্পর সমকক্ষ হওয়াকে আবশ্যিক করে। অথচ শাহান্শাহে বাগাদদের নিষেধাজ্ঞা (প্রাপ্ত)র আওতায় অন্যধিক দুই গাউসুল আ'যমের সমকক্ষ তৃতীয় কোন সত্তা সাব্যস্ত করার পথই বন্ধ। শায়খ-ই আকবর মাইউদ্দীন ইবনুল আরবী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দর্শনালোককে- “এ প্রকারের মধ্যে তুল্য শেষ সম্ভাবন তথা খাতিমুল আওলাদ” বলে ফুসুসুল হিকম-এ কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবরূপ মর্মেও শাহান্শাহে মাইজভাণ্ডার হযরত ক্বিবলার তুল্য আর কারো আবির্ভাবের কথা বলার সুযোগ নেই। এতেকরে এ যুগবৃত্তের অবসানে একমাত্র খোলা পথ হিসেবে তদুচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পন্ন কোন সত্তার কথা বলতে গেলে, সেক্ষেত্রে হযরত ইমাম খলীফাতুল্লাহ আল মাহদী এবং হযরত ঈসা রুহুল্লাহ আলহাইমিন্ সালাম ব্যতীত অপর কারো পক্ষে দলিল পাওয়া যায় না। অতএব হযরত ইমাম খলীফাতুল্লাহ আল মাহদী আলহাইমিন্ সালামের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত শাহান্শাহে মাইজভাণ্ডার, হযরত ক্বিবলায়ে আলম, গাউসুল আ'যম, শাহে দু'আলম, সাইয়্যদুনা ওয়া মাওলানা সৈয়্যদ আহমাদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী রাধিয়া আনহুল্লাহুল বা-রী'র বোলায়তের নিয়ন্ত্রণাধীন যুগবৃত্তই চলতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর জ্ঞানে উদ্ভাসিত সত্তাই অধিক জ্ঞাত।



শাহান্শাহে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শাহান্শাহে মাইজভাণ্ডার রাধিয়াল্লাহু আনহুর ইহলোককে আবির্ভাব স্মারক দিবসের এক অপক্কপ মিলন

এস এম জাফর ছাদেক আল আহাদী

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যই। দুর্কদ-সালাম ও তাহিয়্যাহ-অভিবাদন শাহান্শাহে মদীনা, নবী-রাসূলকুল সরদার, হাবীবের পরওয়ারদিগার, প্রিয় নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন, শাফীউল মুনিবীন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ও তাঁর সকল প্রিয়জন বিশেষতঃ সমস্ত সাহাবায়ে কেবরাম, খোলাফায়ে রাশিদীন, আইম্মায়ে আহলে বাইত, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, আউলিয়ায়ে কামেলীন-মুকামিলীন বিশেষতঃ শাহান্শাহে মাইজভাণ্ডার ইমামুল আউলিয়া ওয়াতত্বরীকৃত হযরত ক্বিবলা-ই আলম শাহে দু'আলম গাউসুল আ'যম সৈয়্যদ আহমাদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী রাধিয়া আনহুল্লাহুল বা-রী ও তদীয় খোলাফায়ে কিরাম, আহলো আওলাদে পাক, মাশায়িখে ত্বরীকৃত সহ সকল প্রিয়জনের জন্য নিবেদিত।

অতঃপর জ্ঞাতব্য যে, বন্ধুর সাথে বন্ধুর মিলন যেমন বর্ণনাতিত আনন্দেপরিই হয়ে থাকে তেমনি মর্যাদাগত অলঙ্কারীয় ব্যবধান সত্ত্বেও মূলগত অভিন্ন অন্তরঙ্গরূপ দুই মহান সত্তার যোজনা ব্যঙ্গক দিবসের ছেদহীন অপরূপ মিলন বর্ণনাতিত মহত্বপূর্ণই বটে। শাহান্শাহে মদীনা ইমামুল আযিয়া সাইয়্যিদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামীন সরকারে দু'আলম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জগতবাসীর জন্য মহা সৌভাগ্য রূপে ধরার বৃকে শুভাগমনের মহান স্মৃতিবিজড়িত ১২ রবিউল আউয়্যল শরীফ পবিত্র ঈদে মীনাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও ইমামুল আউলিয়া ওয়াতত্বরীকৃত হযরত ক্বিবলায়ে আলম শাহে দু'আলম গাউসুল আ'যম সৈয়্যদ আহমাদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী রাধিয়াল্লাহু আনহুর এ ধরায় শুভাগমন স্মারক দিবস মহান ১ মাঘ ঈদে বেলাদতে শাহান্শাহে মাইজভাণ্ডার হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী এ পর্যায়ে চান্দ্র ও সৌরবর্ষের পরিভ্রমণ যোগে একই তারিখ ১৪ জানুয়ারী ২০১৪ খ্রীষ্টাব্দে সোম ও বুধের মধ্যবর্তী মঙ্গলবারে এসে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আলিঙ্গিত। এহেন মহান যোজনার অনুকূল তরঙ্গে যথার্থভাবে হিল্লোলিত হতে পারার মধ্যে নিঃপ্রাণে প্রাণের সঞ্চার, যুগন্তের জাগরণ এবং প্রাণবন্তের অমরত্ব লাভের মতো মহা সৌভাগ্য বিজড়িত থাকা, সুদূর অতীত থেকে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য।

তাইতো শাহান্শাহে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শুভাগমন বদৌলতে বিশ্বময় অসংখ্য মুমীন-মুসলমানের জাগরণ আজো অব্যাহত ধারায় চলমান। নিশ্চয়ই প্রাণের সঞ্চারোপরি স্পর্শবল্য শুকনো কাঠের শুভ্র বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মতো জীবন্ত হয়ে বিরহে ক্রন্দন করতে থাকলে সান্ত্বনা দানে শান্ত হওয়া এবং আবু জাহলের মুষ্ঠিবদ্ধ কঙ্কর কর্তৃক তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য দিয়ে কলিমা পাঠ করা প্রভৃতিও জগতবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। প্রাণবন্তদের অমরত্ব লাভন্য অসংখ্য সৌভাগ্যবানের দুই মহান সাহাবী-ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তের শতাধিক বছর কাল মাযার শরীফে অক্ষত থাকার ঘটনা ১৩৫১ হিজরী ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২০ জিলহজ্জ জগতবাসী প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছে।

অনুরূপ শাহান্শাহে মাইজভাণ্ডার রাধিয়াল্লাহু আনহুর শুভাগমন বদৌলতে পুনঃজাগরণ ঘটা উত্তর অব্যাহত থাকা দৃশ্যমান। তাঁর কেবামতের অংশ বিশেষ মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার জগতবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। প্রাণবন্তদের অমরত্ব লাভ ধন্য অসংখ্য সৌভাগ্যবান মাযার শরীফে অক্ষত থাকার প্রমাণ স্বরূপ কতেক সত্তাকে জগতবাসী প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তন্মধ্যে- ১. হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাধিয়াল্লাহু আনহুর বিশিষ্ট খলীফা শাহসুফী মাওলানা সৈয়দ আব্দুস সালাম ভূজপুরী কুদ্দিসা সিররুহুকে ইত্তেকালের প্রায় দেড় বছর পর, ২. হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাধিয়াল্লাহু আনহুর বিশিষ্ট ভক্ত জনাব সৈয়দ আহমদ হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, নানুপুর, ফটিকছড়ি কে ৩৭ বছর পর, ৩. কুতুবুল আকুতাব বাবা ভাণ্ডারী রাধিয়াল্লাহু আনহুর দৌহিত্র শাহাদা সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম প্রকাশ গায়েবীধন মাইজভাণ্ডারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ মাওলানা আব্দুর রশীদ মাইজভাণ্ডারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, নোয়াপাড়া, রাউজান, ২৪ বছরাধিক পর এবং ৪. হাফয়ালছড়ি দরবার শরীফের প্রাণসত্তা হাদীয়ে যমান গাউসুল ওয়াক্ত আল্লামা কায়ী সৈয়দ হারুনুর রশীদ রাধিয়াল্লাহু আনহুর মুরীদাহ-আতুস্পত্রী সখিনা খাতুন, বাকর আলী তালুকদার বাড়ি, কারন সিঁকদার পাড়া, পাইনং, ফটিকছড়িকে ইত্তিকালের ৭ বছরাধিক পর প্রত্যক্ষ করা প্রভৃতি ঘটনা বিদিত রয়েছে।

পক্ষান্তরে আলোচ্য মহান দুইয়ের এঁহেন অভিন্ন স্মারক দিবসে উক্তরূপ বহুল স্মৃতিই বিজড়িত। অপারিসীম স্মৃতির ভিড়ে বোধবুদ্ধির কলম অচল। এলোমেলো এ লিখাই যেন অসীমকে সীমাবদ্ধ করে ফেলার অপরাধ। আত্মহারা হতে পারলেই যেন বলা হতো সব। যেখানে সব পাওয়া যায় সেখানে কি পেয়েছি, কি পার হিসেব কষাই তো নিজ অক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মূলতঃ এঁহেন অভিন্ন দুই মহান সত্তার একাকারে অপারিসীম করুণাবারি সিক্ত হওয়ার আক্কেল হৃদয়ঙ্গম করে যথাযথ সাড়া দানে সক্ষমদের চাওয়া-পাওয়ায় অর্পণ কিছুই না থাকাই বিদিত।

সেখানে না চাওয়া সত্ত্বেও জগতবাসীর অপারিসীম পাওয়ার স্মৃতিও বিজড়িত।

তাইতো শাহান্শাহে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ধরার বুকে শুভাগমন দৌলতে জগতবাসী লাভ করেই চলছে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের চির সৌভাগ্য, বিধিস্ত আস্থা-বিশ্বাস ফিরে পেয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাসের বলে বলিয়ান হওয়ার মহাসৌভাগ্য ঈমান, ইহপারলৌকিক শান্তি-মুক্তি ও সাকল্য লাভের ধর্ম-দর্শন পবিত্র ইসলাম, ইহ-পরকালীন সর্বস্বীন দিগ্‌দর্শন পবিত্র কুরআন ও তদ্ব্যাখ্যায় সমূহ হাদীস শরীফ এবং 'আল্লাহর দানের বটনকারী তিনি' (বোখারী শরীফ) মর্মে আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় দান লাভের উপায়-অবলম্বন। পবিত্র কুরআন মজীদের নির্দেশনায়-রাহমাতুল্লিল আলামীন' (সূরা আযিয়া:১২) পাঠা ১০৭ আয়াত) মর্মে সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হয়েই চলছে। আরো ইরশাদ হচ্ছে- 'অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণের উপর বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মধ্যে রাসূলকে প্রেরণ করেছেন' (আল-ই ইমরান, ৩) পাঠা ১৬৪ আয়াত) মর্মে তাঁর শুভাগমন মু'মিনদের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ প্রাপ্তির মহাসৌভাগ্য বৈকি! অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলার এঁহেন মহান অনুগ্রহ ও রহমত লাভে ধন্য হওয়াকে উপলক্ষ করে আনন্দ উদ্‌যাপনের সাফল্য বর্ণনায় পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে- (হাবীব!) আপনি বলুন, আল্লাহর দয়ারদান ও রহমতকে কেন্দ্র করে তারা (আপনার উম্মতগণ) যেন আনন্দ উদ্‌যাপন করে; এটাই হবে তারা যা'ই সঞ্চয় করবে সমুদয় থেকে সর্বোত্তম (সূরা ইউনুস: ১১) পাঠা ৫৮ আয়াত)।

শাহান্শাহে মাইজভাণ্ডার রাধিয়াল্লাহু আনহুর শুভাগমন দৌলতে জগতবাসী আবাবো পুনঃসংস্করণে ব্যাপক ভাবে লাভ করে চলছে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের চির সৌভাগ্য; তাঁর সান্নিধ্য ও ত্বরীক্বা-দর্শনালোকে সৃষ্ট স্বীকৃত অসংখ্য ওলীযুল্লাহ তারই সু-উজ্জ্বল প্রমাণ। আরো লাভ করে চলছে নির্ভেজাল ঈমান রত্ন, পবিত্র ইসলামের সঠিক ও কার্যকর শিক্ষা-দীক্ষা এবং পবিত্র কুরআন-হাদীস-সুন্নাহ'র প্রকৃত সার। তিনি নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পর্যায়ক্রমিক বিকাশ ধারার সমুজ্জ্বল দীপ্তালোক স্বরূপ 'কুতুবিয়্যত-গাউসিয়্যত-এ কুবরা' বৈশিষ্ট্যে নবুয়াতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এক গুণরূপ (গাউসুল আযম অভিধা) মর্মে আপন যুগবৃত্তে আল্লাহর দান বটনকারী হন। পরন্তু স্বাধিকারে দান ও বঞ্চিত করার বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদায় সমাসীন অনধিক দুই গাউসুল আ'যমের তিনিই সমাপক গাউসুল আ'যম সত্তা (প্রাপ্তক)। এ মহান সত্তা অপারিসীম দয়ার সাগর হন বিধায় স্বাধিকারে বঞ্চিতকরণ ক্ষমতার প্রয়োগ যেন এক পরমাণুর চেয়েও কম পরিলক্ষিত হয়; যেন অপরিহার্য প্রয়োজনেই এটির প্রয়োগ মাত্র। তাই কারো চরম বেয়াদবীর ক্ষেত্রে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখার

অনিবার্য প্রয়োজনে কারো বেলায়ত ছিলিয়ে নেয়া কিংবা অকাল মৃত্যু ঘটানো কিংবা কাফির হয়ে মরার কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় (জীবনী ও কেরামত, আঙ্গিনায়ে বারী ইত্যাদি)। অথচ স্বাধিকারে দানের ক্ষেত্রে- অসংখ্য সত্তাকে বেলায়ত দান, আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য দান, যুতের প্রাণ দান, মৃত্যুকালীন আজরাইল ফেরত ও আয়ুবুদ্দী, বৃষ্টি চাওয়ায় বৃষ্টি দান, নিঃসন্তানকে সন্তান দান, নিফল বৃক্ষে ফলদান, অল্প খাদ্যে অনেক লোকের আপ্যায়ন, বিপদগ্রস্তকে অলৌকিকভাবে উদ্ধার, দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি, দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি, যে কোনরূপ সাহায্য প্রার্থীকে অলৌকিকভাবে সাহায্য এবং হাজত-মকসুদ পূরণ প্রভৃতিরূপ অসংখ্য কেরামতাবলী সহ হাশর-কিয়ামত পর্যন্ত যে কোন সাহায্য প্রার্থীকে উম্মুক্ত সাহায্য করবেন বলে ঘোষণা দান লক্ষণীয় (জীবনী ও কেরামত, আঙ্গিনায়ে বারী ইত্যাদি)।

উক্তরূপ সমূহ দানের অপরিসীম মহাসাগর শাহানশাহে মাইজভাণ্ডার রাশিয়ান্লাহ আনস্থর কৃপাবিতরণে করণাবারি রূপে ধরার বৃকে শুভাগমন তো আল্লাহ তা'আলার অসীম দয়া-অনুগ্রহের যুগান্তকারী এক সুমহান দান। এহেন দয়া-অনুগ্রহের দান প্রাপ্তিসহ সর্ব-সাকল্যে উল্লেখিতরূপ অভিন্ন দুই মহান সত্তার একাকারে অপরূপ আলিঙ্গিত স্মরক দিবস উদযাপনের সার্বকতা তাৎপর্যে পূর্বোক্ত আয়াতে কুরআন মজীদে মর্য্য পরিশেষে আরেকবার স্মরণ করি, ইরশাদ করলেন- “(হাবীব!) আপনি বলুন, আল্লাহর দয়ার দান ও রহমতকে কেন্দ্র করে তারা যেন আনন্দ উদযাপন করে; এটাই হবে তারা যা'ই সঞ্চয় করবে সমুদয় থেকে সর্বোত্তম।”



জগতগুরু মুহাম্মদ মুত্তফা সান্নালাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লামা দীক্ষিত শ্রেমের শিক্ষা ও সত্য-শ্রেমের দীক্ষা নিয়ে

ইমামুল আউলিয়া গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাশিয়ান্লাহ আনস্থর আগমন

বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর

গোপন খনি থাকাকালে (যখন কালেরও অস্তিত্ব ছিলনা) আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সমেত প্রকাশের প্রীতিই প্রেম। এ প্রেমের কারণেই সৃষ্টির সূচনা। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহর ঘোষণা, “আমি লুকায়িত খনি ছিলাম, অতঃপর যাত-নিফাত বা সত্তা ও গুণাবলীসহ প্রকাশের প্রীতি হেতু বিশেষ সৃষ্টি তথা নূরে মুহাম্মদী সান্নালাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লামা সৃজন করলাম”। ওই নূর জমায়ে খোদাওয়াদারী জলওয়া বা বলক হওয়াতে আল্লাহ ওই নূরের প্রতি অনুরাগী। গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাশি.)'র বিশিষ্ট খলিফা বাহরুল উলুম সান্নালাহ মুফতি আবুল বরাকাত আব্দুল গনি কাঞ্চনপুরী (রাশি.) বলেন,

আজব নামে খোদা হো তোম পিয়ারে জানি মুহাম্মদ
খোদা আশেক মাস্তক হো তোম পিয়ারে জানি মুহাম্মদ।

মুসান্নাফে আব্দুর রায়ফাকে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাশি.)'র বর্ণিত হাদীসের মর্মমতে সমগ্র সৃষ্টিজগত পর্যায়ক্রমিকভাবে নূরে মুহাম্মদী সান্নালাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লামা হতে সৃজিত। সুতরাং সমস্তই আল্লাহর প্রেমময় বিকাশ হেতু তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বত্র বিরাজিত সর্বময় ক্ষমতাধর। পক্ষান্তরে স্রষ্টা ভিন্ন অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব আপেক্ষিক মাত্র। এ পরম সত্যের উপলব্ধিতে ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি-অনুরাগ বিসর্জিত হয়ে স্রষ্টার প্রতি আকর্ষিত আকৃষ্ট হওয়াই সত্য প্রেম। আল্লাহ বান্দার অন্তরে ওই সত্য প্রেমের আকর্ষণ জাগান আপন কোন মাহবুব বান্দার মাধ্যমে। আল্লাহর যাত-নিফাত তথা সত্তা ও গুণাবলীর প্রকাশ অনাদি-অনন্ত সৌন্দর্যের ধারক মাহবুব বা প্রেমাস্পদ নবী মুহাম্মদুর রাসুল্লাহ সান্নালাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লামা আপন মাহবুবীয়্যাত বা প্রেমাস্পদত্বের দূর্বীর আকর্ষণে সৃষ্টিকে স্রষ্টার প্রতিই টেনে নিয়েছেন। সর্বময় আল্লাহ দর্শন কিংবা সর্বত্র আল্লাহ অস্তিত্ববান তথা শহীদী কিংবা অজুদী ভাবধারাকে ঈমান এবং এর বিপরীতকে কুফর বলে আখ্যায়িত করে শুদ্ধ ভিন্ন আদ্যের প্রতি প্রীতি ও আকর্ষিত না হওয়ার শিক্ষাই দিয়েছেন।

عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالمدينة في أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل يدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال اصبح من عبادة مؤمن بنى وكافر بالكر كب فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذا لك مؤمن بنى وكافر بالكر كب واما من قال مطرنا بنى وكذا فذا لك كافر بنى مؤمن بالكر كب -

‘হযরত মায়েদ বিন খালিদ জুহানী (রা.ডি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হুদাইবিয়ায় আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ান, তখনও রাতের বৃষ্টিপাতের চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল। নামাযান্তে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা উপস্থিতির দিকে ফিরে বললেন, তোমারা কী জান, তোমাদের প্রভু কী বলেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, ‘আমার বান্দাদের কারো সকল ঈমানের আর কারো সকল কুফরের ওপর হয়েছে। যারা বলেছে, আল্লাহর দয়ানুগ্রহে বৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা আমার উপর ঈমান রেখেছে, যারা বলেছে, অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বারিপাত হয়েছে, তারা আমার দয়ানুগ্রহকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রবাজির ওপর ঈমান রেখেছে।’ (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ঈমান)

অন্য হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে:

عن أبي حمزة قال قال رسول الله ﷺ قال الله تعالى يردني إلى ما كنت عليه

অর্থাৎ: হযরত আবু হুরাইরা (রা.ডি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ ফরমান, ‘আদম সন্তান যুগকে গালি দেওয়ার মাধ্যমে আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ আমিই যুগ (অর্থাৎ যুগের স্রষ্টা, যুগের আবর্তন বিবর্তনকারী, যুগনিয়ন্তা স্বাধীন কর্তৃত্ববান কার্যনির্বাহক, তারা যে কাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে যুগের প্রতি করতঃ গালি পাড়ে, তার সৃষ্টিকর্তা আমি হওয়াতে ওই গালি আমার প্রতিই প্রত্যাবর্তিত হয়।)। একচ্ছত্র কর্তৃত্ব আমারই, আমি দিব্যাবির পরিবর্তন ঘটাই’। (মিশকাত শরীফ, কিতাবুল ঈমান) এতে সুস্পষ্ট যে, যুগের মৌলিক কোন অস্তিত্ব নেই বরং যুগের অস্তিত্ব আল্লাহর অস্তিত্ব এবং আল্লাহ অংশীদারিত্ব হতে পূতপরিব্রত। হাদীসে পাকে আরো বিবৃত:

عن أبي حمزة قال قال رسول الله ﷺ ان الله تعالى يردني إلى ما كنت عليه

‘কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা’আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি যখন অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা করনি। বান্দা বলবে, হে প্রভু! আমি কী রূপে তোমার সেবা-শুশ্রূষা করবো? অথচ তুমি সমস্ত জগতের পালনকর্তা। আল্লাহ

বলবেন, তুমি কি জাননা যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, কিন্তু তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করনি। যদি তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করতে তবে আমাকে তার নিকটেই পেতে। আল্লাহ বলবেন, হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে আহ্বার চেয়েছি, তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দা বলবে হে প্রভু! আমি কী করে তোমাকে খাওয়াব? তুমি যে রাবুল আলামীন! আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জাননা আমার অমুক বান্দা! তোমার নিকট খাবার চেয়েছিল, অথচ তুমি তাকে খাবার দাওনি। তুমি কি জাননা তাকে খাবার দিলে আমাকে তার নিকটেই পেতে। হে আদমের বেটা! আমি তোমার নিকট পালি চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে পালি দাওনি। বান্দা বলবে হে প্রভু! আমি কী করে তোমাকে পালি পান করাই? তুমি যে সমগ্র জগতের রব। আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পালি চেয়েছিল, তুমি তাকে পালি দাওনি, তুমি তাকে পান করালে আমাকে তার নিকটেই পেতে’। (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ- বাবু সাওয়াবিল মু’মিনি ফীমা ইয়াসিবুহ মিম মারাদ্বীন আও হাযানিন)

সর্বত্র সর্বময় আল্লাহর দর্শন কিংবা সমুদয়ে আল্লাহই মৌলিক অস্তিত্ববান হওয়া আল কুরআনুল করীমের বর্ণনালোকে সুপ্রমাণিত। এ ধরনের কয়েকটি আয়াত এখানে উপস্থাপিত হল। এক. ইরশাদ হচ্ছে, وَاللَّهُ نَزَّلَ الْمُسْطَافَاتِ وَالْأَرْضِ

সর্বত্র সর্বময় প্রভু অস্তিত্ববান কিংবা পৃথ্যমান মর্যীয় দর্শনালোকে আপেক্ষিক ও ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টির প্রেক্ষাকর্ষণে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে স্রষ্টা প্রেমের দূর্বীর আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে দ্বিত্বের বেড়াভাল ছিন্ন করে একত্বের মিলনে আপন আশিত্ব, অস্তিত্ব বিসর্জনের অমর-অনন্ত প্রেমের শিক্ষাই রয়েছে জগতগুরু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দীক্ষিত প্রেমের শিক্ষায়। এখানে বান্দার যাবতীয় কর্মকাণ্ডই আল্লাহকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে। তাই আল্লাহ তা’আলা বলেন: وَاللَّهُ رَبُّ الْمُسْلِمِينَ

দীক্ষা দিতে আসেন জগতগুরু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাদীসের বাণী, ^{سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ} 'আমি শিক্ষক রূপে প্রেরিত'। কুরআনের বাণী, ^{وَمَا كُنَّا بِمُرْسَلِينَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَنبِئُوا بِالْحَقِّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} 'আমি তোমরা প্রত্যেকের প্রতি আল্লাহর রাসূল'। (সূরা আরাফ ১৫৮ নং আয়াত)। হযরত সিদ্দিক, ফারুক, যুনায়েন, হযরদার, সালমান, আবু যর (রাঃ)। সহ সকল সাহাবী এ প্রেমই দীক্ষিত এবং দীক্ষাগুরু ছিলেন। হযরতে আ-ইমামে আহলে বায়ত থেকে শুরু করে বুজামী, বাগদাদী, শিবলী, মিসরী, জিলানী, চিশতী, সা'দী, রুমী, জামী, সিরাজী (রাঃ)। প্রত্যেকই এ প্রেমের আদান-প্রদান, দীক্ষা অর্জন-দান করে গিয়েছেন। এ প্রেমই ^{سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يُلَاقِيكَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ} হযরত বড়পীরকে (রাঃ)। মিলন পেয়লা পান করিয়েছে। এ প্রেমই ^{لَا يُلَاقِيكَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ} কুমীকে বিচ্ছেদের বাঁশরী বাজাতে বাধ্য করেছে। এ প্রেমের মদে মত্ত হয়েই সিরাজী বলেছেন:

^{مَنْ لَمْ يَلْقَ اللَّهَ فِي سُبْحَةٍ أَوْ مَسَاءٍ لَمْ يَلْقَ اللَّهَ فِي سُبْحَةٍ أَوْ مَسَاءٍ}

'পীরে যুগা যদি বলেন তবে শরাবে মসল্লা রঙ্গিন কর, কেননা ছালেক মিলনপথ ও মনয়িলসমূহের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সম্পর্কে বেষবর নন'। এ প্রেমের গানই গীত হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে,

খোদার প্রেমে শরাব পিয়ে বেঁধেই হয়ে রই পড়ে,
ছেড়ে মসজিদ আমার মূর্শিদ এল যে, এ পথ ধরে।

জগতগুরু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীক্ষিত প্রেমের শিক্ষা নিয়েই এ ধরনপ্রেম পদার্পণ করেন ইমামুল আউলিয়া হযরত গাউসুল আ'যম শাহসুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাওয়ারী (রাঃ)। সূফী কবি আল্লামা বজলুল করীম মদনকীনি (রাঃ) বলেন,

অবশেষে ভাগ্যবলে প্রভুর করুণা ফলে,
সত্য প্রেমের দীক্ষা নিয়ে মাইজভাওয়ারীর আগমন।

সত্য প্রেমের একজন সফল দীক্ষাগুরু হিসাবে গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়ারী (রাঃ)। প্রেম-দীক্ষিত অসংখ্য প্রেমগুরু (খলিফা) সৃষ্টি করে গিয়েছেন। সূফী কবি আল্লামা আব্দুল হাদী (রাঃ) বলেন,

'প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে টুটা ফটা দিন কিনিয়ে,
সেকান্দরী আয়না তাতে করেন তৈয়ার'।

আপন মাহবুবী শানে বিমোহিত করে অনেককেই প্রেম শাস্ত্রের মাওলানাতে পরিণত করেন। বাহরুল উলুম মুফতি আল্লামা আবুল বরাকাত আব্দুল গনি কাঞ্চনপুরী (রাঃ) বলেন,

শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়ারী ^{রব্বি} প্রবন্ধ সম্ভার
না জানিতাম প্রেম নাম, না চিনিতাম বন্ধের ঠাম,
অজ্ঞ প্রেমে মকরুলেরে মাওলানা বানাইলার'।

অগণিত পথহারাকে তিনি দিয়েছেন হিদায়ত তথা সত্য প্রেমের সঠিক দিশা এবং সত্য প্রেমের অনলে জ্বলিয়ে পরিণত করেছেন ষাঁটি ইনসানে কামিলে। গাউসুল ওয়াক্ত কুতবে দাওরান ইমাম আ'যমে যমান মুহাক্কিকে না-ছান আমীনে আমানতে সুবহান শাহীখুল ইসলাম মুফতিয়ে আ'যম হযরতুলহাজ্ব শাহসুফী আল্লামা আমীনুল হক ফরহাদাবাদী (রাঃ) লিখেছেন,

^{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ^{وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِيمَانُ سَابِقٌ بِالْآيَاتِ}

(ইয়ানযুর বিআইনিশ শফক্বাতি ইলাল খাসসি ওয়াল আন্নিম, ইয়হুদী ইলা সাবিগির রুগদি লিল আনামি, ইউতী বিনুরিন নযরি নারাল মুহাক্বাতি ফী কুল্লুরি আহলিস সিদ্দিকি ওয়াল ইতিক্বাদি) অর্থাৎ: সমাদরে আম-খাছ লোকগণ তরে, প্রভু নিরঞ্জন পথে হিদায়ত করে।

মেহের নজর করে যাহার উপর, প্রেমের অনলে দহে তাহার অন্তর।

জগতগুরু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আব্বান আল্লাহরই দিকে এবং প্রাণ দেওয়ার জন্যই সূরা আহযাব ৪৬ নং আয়াত ^{وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دِينِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ تَعَالَى} ও সূরা আনফাল ২৪ নং আয়াত ^{وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دِينِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ تَعَالَى} মর্মে তা সুস্পষ্ট। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার তাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জাহেদী কিংবা বাতেনী যুদ্ধে শাহাদত বরণকারীদের মৃত বলতে নিষেধ করে জীবিত জীবিকা প্রাপ্ত ঘোষণা দেন আল্লাহ তা'আলা। আল কুরআনের সূরা বাক্বারার ১৫৪ নং আয়াত ^{وَلَا تَحْسَبَنَّ الْمَوْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا حَسِبَ اللَّهُ الْمَوْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضَلَالًا عَظِيمًا} এবং সূরা আল-ইমরানের ১৬৯ নং আয়াত ^{وَلَا تَحْسَبَنَّ الْمَوْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا حَسِبَ اللَّهُ الْمَوْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضَلَالًا عَظِيمًا} ইমরানের ১৬৯ নং আয়াত ^{وَلَا تَحْسَبَنَّ الْمَوْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا حَسِبَ اللَّهُ الْمَوْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضَلَالًا عَظِيمًا} আলেক শহীদগণের চিরস্থায়ী জীবনের প্রমাণ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহর খলিফা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতিনিধি হিসাবে ইমামুল আউলিয়া গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়ারী (রাঃ)।'র আব্বান ও আল্লাহর দিকে এবং প্রাণ দেওয়ার জন্যই। তাইতো তাঁর সংস্পর্শে এসে অগণিত মানব-দানব আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছেন এবং চিরস্থায়ী জীবন পেয়েছেন, তাঁর দীক্ষিত ও প্রবর্তিত মাইজভাওয়ারী ত্বরীক্বায় আজও পাচ্ছেন। তাঁর মাহবুবীয়ত বা প্রেমোদ্ভবত্বের তীর বা খঞ্জে বধিতজনরা চিরস্থায়ী জীবন লাভে ধন্য হয়েছেন। যেমন তাঁর বিশিষ্ট খলিফা আল্লামা আব্দুল সালাম ভূজপুরী (রাঃ)।কে ইস্তিকালের প্রায় দেড় বছর পর কবর শরীফ হতে তুললে তাঁর কাশ মোবারক অবিকৃত এবং শরীর হতে ঘাম নির্গত হচ্ছে দেখা যায়। এ ধরনের আরো বহু প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়, তবে কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় কেবল একটিতে তৃপ্ত হতে হল।

পক্ষান্তরে ইমামুল আউলিয়া গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.রা.)'র আগমনে প্রেমের বসন্ত এবং সর্বত্র প্রাণের সাড়া জেগেছিল। তাঁর কামিলে মুকামিল অসংখ্য খলিফা এবং মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্বার ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হতে থাকে অগণিত আউলিয়া-এ-কিরাম আমাদের দৃষ্টিকে সে সত্যের প্রতিই আকর্ষিত করে। আরিফ কামিল কবি বাহরুল উলুম আল্লামা শাহসুফী আব্দুল গনি কাঞ্চনপুরী (রা.রা.) কতইনা সুন্দর বলেছেন,

গাউছে ধনের প্রেম বাগানে, নিরঞ্জনের কৃপাঞ্জে,

প্রেমের বসন্তঝড় আশিলারে।

ফুলের সুগন্ধি এল, মূর্দা দিন যিন্দা হল,

অমর নগর পস্থা খুলিলারে।

জমিনে আপদকূলে, আবশ্যে ফিরিশ্ভাদলে,

মারহাবা মারহাবা ধবনি পড়িলারে।

খোদা ও মুক্তফা বলে, মকবুল অধীনে বলে,

ছলে আলা একি বাহার হইলারে।

প্রেমাকানের উজ্জ্বল রবি ইমামুল আউলিয়া গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.রা.) সে প্রেমেরই দীক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, যা জগতগুরু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দীক্ষিত প্রেমের শিক্ষা। আল্লামা আব্দুল হাদীর ভাষায় ভাষার সে বন্দাবন, প্রেমনিধি গাউছে ধন'। এ প্রেম সর্বত্র প্রভু দৃশ্যত কিংবা সবথানাতে প্রভুর অস্তিত্ব মর্মীয় দর্শন রয়েছে বিধায় জাগতিক মোহ মায়ায় যেমন জড়ানো, তেমনি জগতের কিছুই উপেক্ষিত-নির্ধাতিত হয়না। বরং সবকিছুই প্রভুর দর্পণ মর্মে প্রেমের দৃষ্টিতে নিরীক্ষিত হয়। ইমামুল আউলিয়া গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.রা.)'র খলিফাগণের ভাষায়,

১. 'যে অবধি হৃদে প্রিয়া করেছে আসন, যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই দর্শন'।

২. 'আরব আ'জম আগর মূলক সারে, ইয়ে হাঙ ইকুলীম মে পিয়ারে,

ধুরনীদো মাহতাব ফলক কী তারে পিয়াকা আয়না বলক রহা হে'।

৩. 'জগত সারা পিয়ারে তোম হো, নয়ন তারা পিয়ারে তোম হো'।

৪. 'সুর্ষের কিরণে, চন্দের আলোকে, নক্ষত্র বলকে, পুষ্পের ছটকে,

জ্বলচে হেরি গাহে করিকুল তোমার মহিমা গান'। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাই এ প্রেম দীক্ষায় দীক্ষিতরা প্রভু মিলন যেমন লাভ করে, তেমনি তাঁর সৃজনের প্রতিও তাঁরই কারণে অগাধ ভালবাসা প্রদর্শন করে। আজকের এ অশান্ত পৃথিবীতে ওই সত্য প্রেমের দীক্ষা-দর্শন তথা মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্বার চর্চা ও অনুশীলন হলে সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিদূরীত হবে সর্ববিদ আশঙ্কিত।



হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র প্রশংসায়

তাঁর খুলাফায়ে ইযাম রাঈয়াল্লাহু আনহুম

তৌহিদুল আলোয়ার মুহাম্মদ আব্দুল হাই আল হাক্কনী

সমস্ত প্রশংসার একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা'র সত্তা ও গুণাবলীর বিকাশ এবং পরম প্রশংসিত নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র পরিপূর্ণ অনুগামী উত্তরসূরী গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র পূর্ণাঙ্গ প্রশংসা বর্ণনা সাধ্যাতীত। বাহরুল উলুম বা জ্ঞানের সমুদ্র খ্যাত ব্যক্তিত্ব অকপটে বলেন,

'গাউসে ধনের মর্ম ভবে সত্য মতে কেবা জানে?

শরীয়তে বান্দা দেখি হাকীকতে খোদা জানে।

প্রভু আর তান মর্ম ভবে কে জানিবে বল,

প্রভুর মর্ম তিনি জানে তানে ভবকর্তা জানে।'

-মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল গনি কাঞ্চনপুরী

মহান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর হাবীব মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র প্রশংসা যেমন প্রত্যেকে আপন আপন শক্তি-সামর্থ্য অনুপাতে করে থাকেন, তেমনি আল্লাহর প্রতিনিধি ও নবীকুল সম্রাট (দ.)'র উত্তরসূরী গাউসুল আ'যম হযরত শাহসুফী সৈয়দ আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র প্রশংসা-কীর্তনও নানা কণ্ঠে নানা ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা তাঁর খলিফাগণের ভাষায় তাঁর প্রশংসার কিছু অংশ তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

এক. মুজাদ্দিদে দ্বীন শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন হযরত আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কু.), যাঁর ব্যাপারে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.) নিজ যবানে বলেন, 'আমার আমিন মিঞাকে আমার ছয়টি কিতাবের একটি দিয়েছি'। যাঁর লিখনীকে কেন্দ্র করে ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহ.)'র পীর-মুর্শিদ মাওলানা সৈয়দ আব্দুল হামিদ বাগদাদী (রহ.) বলেন, 'তাঁর লিখনীতে হীরাধার আছে।' যাঁর বিষয়ে শেরে বাংলা (রহ.) বলেন, 'মিসলে উ হারগিয় মুহাক্কিক মন নবীনম দর জাহাঁ বা তাঁর মত তত্ত্বজ্ঞানী আমি জগতে কখনো দেখিনি।' তাঁর লেখিত তুহফাতুল আখইয়ার গ্রন্থখানায় স্বয়ং গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.) স্বাক্ষর করেছেন। ওই তুহফাতুল আখইয়ার গ্রন্থেই তিনি গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র শানে লিখেছেন,

সৈয়দুল কাওনাইনি তাজুল আসফিয়া, মুর্শিদুল আফাকি ফখরুল আউলিয়া।

আশরাফুল মাখলুক ফী হায্য যমান, রহমতুল্লিলি 'আলামীনা যিলুল আমান।
মুসদক্ আনওয়ারি রাবিল 'আলামীন, কুবলাতুত তৌহীদি লি-আহলিল ইয়াক্বীন।
ওয়জহুহ মিসুল মিরাতিল লিল ওয়ারা, ফীহি ওয়জহুহা হি তা'আলা ইয়ারা।

ক্বাদ বাদা ফীল 'আলামি বদরুল কামাল, যানা বিহী মিনহু যল্লামুদ দানাল।

সৈয়দুল আব্বারি যুল মজদিল ফখীম, গাউসুল মাইজভাণ্ডারী যুল ফদলিল 'আমীম।

অর্থাৎ 'উভয় জগতের সর্দার, আসফিয়াদের মুকুট; বিশ্বজগতের পঞ্চদর্শক, ওলীদের গৌরব। এ যুগে সৃষ্টির সেরা, সমগ্র জগতের রহমত, নিরাপত্তার ছায়া। আল্লাহ রাবুল 'আলামীনের নূরসমূহের উৎস, আহলে ইয়াক্বীনদের জন্য তৌহীদের কুবলা। তাঁর চেহারা জগতের জন্য দর্পণ সাদৃশ্য, যাতে আল্লাহর চেহারা দেখা যায়। জগতে পৃথিবীর অল্পদূর ঘটেছে, যাক্বারা সেখান হতে ভ্রষ্টতার আঁধার বিদূরীত হয়েছে। পুণ্যবানদের সর্দার, বিশাল মহত্বের অধিকারী, গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী ব্যাপক অনুগ্রহের মালিক।

দুই. হযরত আকদসের অনুগ্রহ প্রাপ্ত 'মকবুলে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী মাজলানা আব্দুল গানি কাঞ্চলপুরী (ক.), সমসাময়িক আলোচনায় যাকে 'বাহরুল উলুম' বা জ্ঞান সাগর অভিহিত করতেন। তিনি হযরতের ফয়েজ প্রাপ্ত খলিফাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, তিনি হযরত আকদস (ক.)'র শান ও ত্বরীক্বা সম্বন্ধে আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর অমর রচনা আঙ্গিনায়ে বারীতে হযরত আকদসের শানে লিখেন—মহাপ্রভুর আসন রবি উদ্দিহ হয়েছে, মানবাকারে খোদার গোপন রহস্য প্রকাশ পেয়েছে। ত্রিভুবন যার আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল, আজ সে আশার পুষ্পরাজ প্রস্তুত হয়েছে। যাকে নিয়ে নবীর আহমদ মুত্তাফা (দ.) গৌরব করতেন, আজ সে গৌরব সূফীদের সার তত্ত্ব খনি জগতে আবির্ভূত হয়েছে।' (আঙ্গিনায়ে বারী-১৪০ পৃঃ)

'ওলীদের শিরোমণি, খোদার গাউছ ভবে পদার্পণ করেছেন। জগদবাসীর প্রাণপ্রিয়, সূফীদের লক্ষস্থল ইমাম ভবে তাশরীফ এনেছেন। দু'জগত তাঁর কদম মোবারকের পাদুকা বিশেষ, জগতে শ্রেষ্ঠত্বের বাদশাহের আগমন হয়েছে।' (প্রাপ্ত-১৩৮ পৃষ্ঠা)

হে আমাদের পরিচাগকর্তা! বরকত আপনার নিকট, আমরা আপনার দিকে অগ্রগামী এবং আশ্রয়ান হয়েছি; সদা সর্বদা আপনার প্রতি আল্লাহর পরিপূর্ণ শান্তি আসতে থাকুক। তুমি আল্লাহর মনোনীত গাউসুল আ'যম এবং সম্মানিত কুতুব। তুমি সর্ব মর্যাদায় একছত্র ও অদ্বিতীয়।

আল্লামা কাঞ্চলপুরী (ক.) "গোলশানে ওশশাক" ৪৩ নং গজলে লিখেন,

'মারহাবা মারহাবা খোদাকা পেয়ারে গাউসুল আ'যম ভাণ্ডারী
সংসার প্রাণ পাওঁকা ছদকা কেইছি ছুরত তোমহারী।

কপাল চমক, বিজলী বলক নুরে খিলী মিলি ইন্দু মুখ
মোবারক নয়ন, শাফল্য জীবন, যু দেখা পেয়ারে ভাণ্ডারী।

আর্শকা ছুরজ জমিতে বিরাজ, খোদাকা আজব রহমত হায়
আল্লাহ নাম জপাইয়ে খোদা পহুচানাইয়ে নিতে কলির পাপী নিস্তারী
খোদাকা কৃপাঞ্জে ভাণ্ডারী এ ভুবনে বড়ী ইয়ে আযব নেয়ামত হায়
কলিকা জমানে গোমরাহী তুফানে আযা হায় কেইছা কাণ্ডারী।

২০ নং গানে লিখেন,

'আহমদ মুহাম্মদ নামে মন প্রাণ মধুময়
গাউসে আ'যম মাইজভাণ্ডারী সেই মধু ভাণ্ড হয়।

তিন. হযরত আকদসের ফয়েজ প্রাপ্ত খলিফা 'বুল বুল' খেতাবে ভূষিত আরিফে কামিল হযরত আব্দুল হাদী (ক.) রচিত রত্নসাগর ২নং গজলে হযরত আকদসের কাছে মিনতি করেন,

'আয় গাউছে মাইজভাণ্ডার মুখে শরবত পিলা দাও
তুফেগীয়ে দিলকো মেরি আজ বুঝা দো
তাছকিন কর দিলকো মেরি গাউছে দো'আলাম
শায়দাকো তেরে পায়ে মোবারক পর লুঠা দো'।

৩নং গজলে হযরত আকদসের শানে লিখেন,

'আয় দেনাবরে দেনাদারে পেয়ারে গাউছে মাইজভাণ্ডার
মালেকে মলকুত পেয়ারে গাউছে মাইজভাণ্ডার
নুরে ক্বহী ছিররে ওহাদাত গাউছে মাইজভাণ্ডার
আফছরে লাহূত পেয়ারে গাউছে মাইজভাণ্ডার
আফতাবে আর্শে আ'যম গাউছে মাইজভাণ্ডার
আহমাদে বে মীম পেয়ারে গাউছে মাইজভাণ্ডার'।

চার. হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র ফয়েজ প্রাপ্ত খলিফা হযরত আব্দুস সালাম ভূজপুরী (ক.); উল্লেখ্য হযরত ভূজপুরী (ক.) কে দাফন করার প্রায় দেড় বছর পর তাঁর পুত্র সৈয়দ মঞ্জুরুল হক ও হাবিবুল হককে স্বপ্নে অন্যত্র দাফন করার আদেশ করেন। গণ্যমান্য ব্যক্তি ও হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে কাফন খুলে দেখেন নুরানী চেহারা হতে বিন্দু বিন্দু ঘাম নির্গত হচ্ছে ও ওষ্ঠদ্বয় নড়ছে। এ মহান ওলী হযরত আকদসের নিকট বেছাল তথা মিলনের আবেদন করে রত্নবিন্দু বইতে লিখেন,

হযরতের শিদ্দমতে আসিতেন। কোন সময় হযরত তাহাকে আদেশ দিতেন, “মামু হায়েব, ‘বাঁশের ঘরে বাস করিয়া’ গানটি গাও তো।” তখন তিনি দোজানু হইয়া হযরতের সামনে বসিয়া নিজ হাটুর উপর দুই হাতে তাল বাজাইয়া গাহিতে থাকেন:

ওহে জগৎ মহাঠক কেন কর দিলদারী

বাঁশের ঘরে বাস করিয়ে পাকাইনু চুল দাড়ী “ইত্যাদি” (গুরুদাস রচিত)।

ঐসিদ্ধ গায়ক গুরুদাস হযরতের ভক্ত ছিলেন। তিনি হযরতের সামনে বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া বৈরাগী সুরে হজরতকে গান শুনাইতেন। হযরত উহা মনযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। তিনি গুরুদাস ফকির নামে পরিচিত। ইহা ছাড়া হজরতের মুরিদ শিষ্য-বোয়ালখালী খানার অন্তর্গত আহলা মৌজার কাজী মৌলভী আব্বাস আলী, পাটিয়ার গোবিন্দেরখিল মৌজার শাহ্ আমিরজ্জমান, কাঞ্চনপুর নিবাসী মৌলানা আবদুল হাদি হায়েবানের মধ্যেও কেহ কেহ হজরতের খেদমতে গান, গজল, নাতিয়া শুনাইতে অনুমতি চাহিলে, তিনি অনুমতি দিতেন এবং শ্রবণ করিতেন। (প্রোক্ত: ১৮২ পৃষ্ঠা)।

তিনি এক সময় আজিম নগর নিবাসী মাষ্টার ফয়েজউল্লাহ হায়েব বাড়ীতে মৌলানা মহিউদ্দিন নামক একব্যক্তিকে মাইজভাণ্ডারী তারিকামতে হালকা জিকির, হেমা ও সেজদায়ে তাহিয়া সম্বন্ধে মাইজভাণ্ডারী ভক্তগণের বিরুদ্ধে ওয়ায়েজ করার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়।

হজরতের মধ্যম ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র ও অন্যতম খলিফা জনাব মৌলানা হৈয়দ আমিনুল হক (প্রকাশ ছোট মওলানা) হায়েব! আজিম নগর নিবাসী মুন্সি হৈয়দ আফজুদ্দিন হায়েবের পুত্র হজরত হায়েবানীর সহোদর ভ্রাতা ও হজরতের ফয়েজ প্রাপ্ত খলিফা আবদুল মজিদ মিঞাকে হজুরের খেদমতে পাঠাইয়া আরজ করিলেন: হজুর! আমরা বহু আলেম দরবারে থাকের শিষ্য ভক্তদের মধ্যে বর্তমান আছি। মহিষখালীর মৌলানা ইকামুদ্দিন হায়েব, রাসুলীয়ার মৌলানা খলিলুর রহমান হায়েব, বাঁশখালীর মৌলানা মোহায়েন হায়েব, সুন্দরপুরের মৌলানা আমিনুল্লাহ হায়েব, কাঞ্চনপুরি মৌলানা আবদুল গণি (আয়নায়ে বারী প্রণেতা) হায়েব, মৌঃ আবদুশ্শোলাম, মৌঃ আবদুল হাদি, ফরহাদাবাদী মৌলানা আমিনুল হক হায়েব এবং হাফেজ করী মৌলানা মোহায়েন হৈয়দ তাফাজ্জুল হোছাইন হায়েব এবং আরো অনেক বিখ্যাত আলেমগণ উপস্থিত আছেন। খোদার ফজলে আমাদের মধ্যে প্রায় সবাই মোনাজেরায় সুদক্ষ। হজুরের অনুমতি পাইলে আমরা মৌলানা মহিউদ্দিনের সাথে বাহাছ মোনাজেরা করিতে ইচ্ছা করি।

হজরত আদেশ করিলেন: “তিনি মুসবী তারিকার লোক, খিজিরী কাজ করবার তিনি কি বুঝিবেন? তোমরা ফাছাদ ও বাহাছ করিওনা। আপন হালতে থাকিয়া যাও। তাহারা তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে।” তখন মৌলানা আমিনুল হক হায়েবের (হজরতের আত্মপুত্র) আদেশে, আবদুল মজিদ মিঞার বাড়ীতে হেমা

শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী ^{কবি} প্রবন্ধ সম্ভার

সহ জজবার মজলিশ করা হয়।

তাহারা হেমার জজবার মজলিশ করা কালে যাহারা আবদুল মজিদ মিঞার বাড়ীর সামনে দিয়া যাইতে লাগিল। হেমার শব্দ কানে আসিতেই তাহাদের জজবার ও সমস্ত শরীর আলোড়ন হইতে লাগিল। সকলেই ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। হিন্দুরা বলাবলি করিতে লাগিল, এই রাস্তা দিয়া যাইওনা। এই বাড়ীতে মক্কা চালান দিয়াছে। কেহ স্থির থাকিতে পারিবেনা। ফলে দেখা গেল মৌলানা মহিউদ্দিনের মজলিস জমিল না, উক্ত মজলিস হইতে প্রায় সকলেই জজবার হালত ও বেখাদ অবস্থায় এই হালকা ও হেমার মজলিসে যোগদান করিতে লাগিল।

(প্রোক্ত: ১৮৫-১৮৭ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত ঘটনাবলীর আলোকে-মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্বয় প্রচলিত ‘সামা’ ইমামুত্তুরীক্বত হযরত কিবলা রাশিয়াল্লাহ তা’আলা আনছ কর্তৃক অনুমোদিত, নিদেশিত এবং তদ্ব্যবস্থায় অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করার বিষয় সুপ্রমাণিত।

গান-গয়লাদির সাথে সম্পৃক্ততা: এক. উপরোক্ত তথ্যসূত্রে হযরত কিবলা রাশিয়াল্লাহ আনছর কতেক ভক্ত, মুরিদ ও শিষ্যদের কিছু কিছু গান-গজলাদি যে, অনুমোদিত হয়ে রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

দুই. হযরতের অন্যতম খলিফা শাহসুফী মওলানা সৈয়দ আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী কুদ্দিসা সিরফুহর গানছ ‘রপ্পে হাদী মাতোয়ারা সঙ্গে গাউছেখন’ সংশোধনী প্রদান পূর্বক অনুমোদন এবং ‘গাউসে মাইজভাণ্ডার মোজহে সরবত পেলা দো’ ইত্যাদি মর্যাদা গানটি শৈশবে ওছিয়ে গাউসুল আ'যম কুদ্দিসা সিরফুহর কর্তৃক ধনিত হলে সরবত পান করানোর মাধ্যমে স্বীকৃতি দেন।

উপরন্তু এ রচয়িতার গান-গজলাদিকে ওয়ীফা হিসেবে গণ্য করার কথাও ইরশাদ করেন। (বেলায়েতে মোতলাকা; জীবনী ও কেরামত)।

তিনি. হযরত কিবলায়ে আনাম গাউসুল আ'যম রাশিয়াল্লাহ তা’আলা আনছর সাহচর্য ও অনুগ্রহ ধন্য খোলাফায়ে কিরাম লিখিত রচনাবলী তো হযরত কিবলার মহিমাপূর্ণ সত্তা ও তদীয় ত্বরীকা-দর্শন উপলব্ধির অন্যতম আয়না। তাঁদের সত্তা তো মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্বা-দর্শনেরই সমুজ্জ্বল আলোকিত রূপ এবং পরবর্তীদের জন্য সঠিক পথের দিশারী। এতদসত্ত্বে তাঁরা প্রত্যেকই স্বীকৃত ওলীয়ে কামিল-মুকামিল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। অতএব তাঁদের রচনাবলী মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্বা-দর্শনের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিলই।

এ ক্ষেত্রে উত্তরসূরীদের কার্যক্রম: খোলাফায়ে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী রাশিয়াল্লাহ আনছম য় য় মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত থেকে এ ত্বরীকা-দর্শনের অনুকূলে প্রমাণ্য যেসব রচনাবলী রেখে যান, তদ্ব্যপেক্ষ গান-গীতি-গজল ইত্যাদির যথাযথ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ধর্মীয় দলিলাদির উদ্ধৃতি সমেত তুলে ধরা গেলে, মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক্বা-দর্শন আরো ব্যাপক সমৃদ্ধ হবে নিঃসন্দেহে।

८३

34

ADDY

627

0162

१२१

4

 $\frac{\Delta}{\Delta}$

पञ्च

165

১৭৭

করে। এতে তাদের শারীরিক-মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। শৈশব-কৈশোরে দুঃখ-শোকের আঘাতপ্রাপ্তদের যা যদি স্নেহ-মমতার পরশে সারিয়ে তোলা না হয়, তবে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়ে বিকলাঙ্গ ও মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে ওঠতে পারে। হয়রত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা) নিজের কর্মের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক বিকাশে অভিভাবকদের দায়িত্ব-কর্তব্যের দিগদর্শন যেমন দিয়ে গিয়েছেন, তেমনি শিশু-কিশোরদের কোমল মনে সাম্য ও মানবতার বীজও বপন করেছেন। হয়রত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা) প্রদত্ত জীবনদর্শন কেবল নসিহতবর্ণী কিংবা Theory মাত্র নয়, বরং বাস্তব আদর্শই। মস্তিষ্ক ও পুঙ্খকের পাতায় সাম্য ও মানবতার চাষ অনেক করতে পারেন কিন্তু আদর্শ মডেল সবাই বনেতে পারেননা। বিশেষতঃ শিশু-কিশোরদের জন্য আদর্শ হওয়াতো কঠিন ব্যাপার। বস্তুতঃ সব শ্রেণীর মানুষের জন্য আদর্শ মডেল হওয়া সর্বশ্রমের অলিঘুলাহাদের পক্ষেও সম্ভব নয়।

শিশু-কিশোরদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও হয়রত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা)র আচার-আচরণ আমাদের জন্য অনুসরণীয়। 'জীবনী ও কার্যমত' গ্রন্থের 'সকলের প্রতি হয়রতের দয়র্দ্রভার ও শিষ্টাচারিতা' শীর্ষক অশ্লুষ্কেদে রয়েছে, 'ছোটদের প্রতি তিনি মামু সাহেব, মিঞা, দাদাভাই ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন'। হয়রত ক্বিবলা (রা.) শিশুদের মনে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শনের মনোবৃত্তি তৈরির কার্যকর কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন উক্তরূপ আচার-ব্যবহারে। এতে ছোটরা বড়দের সম্মানে সমোদন করার রীতি সহজেই রপ্ত করবে। শিশুদের ডাক শেখাতে হয় 'আব্বা' ডেকেই 'আব্বা ডাক' বলে নয়।

হয়রত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.) সহস্রোশে শিশু-কিশোরদের আকার মিটাতেন। জীবনী ও কার্যমত গ্রন্থের 'হয়রতের গাউছিয়ত স্বীকৃতি' শীর্ষক অনুচ্ছেদে বর্ণিত, 'হয়রত শাহসুফী মাওলানা সৈয়াদ দেলাওর হুসাইন সাহেব বলেন, শৈশবে একদা আমি খেলার ছলে বাড়ির আদিনায় গান করিতেছিলোম—

'গাউছে মাইজভাণ্ডারী মুজহে শরবত পেলাদো,

তিথেগিয়ে দিনকো মেরে আজ বুজাদো।

আফছরে লাহুত হু তোম মালেকে মলকুত,

ইন ছবকা তামাশা মোজহে আর মাজলা দেখাদো।'

[মাওলানা আব্দুল হাদী রচিত রক্তসাগর]

এই সময় হয়রত সাহেব কেবলো আন্দর বাড়িতে গণী শরীফে বসিয়াছিলেন। আমার গান শুনিতে পাইয়া খাদেমকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, 'দুধের শরবত বানাও'। তারপর আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি লজ্জিত হইয়া সামনে

আসিয়া দাঁড়াইলাম। হয়রত আমাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'দাদা ময়না শরবত খাইবেন?'

হয়রতের সামনে একজাম দুধের শরবত দেওয়া হইল। প্রথমে তিনি নিজেকে কিছু শরবত গ্রহণ করিলেন। বাকী শরবত একবার তিনি পান করেন, কিছু আমাকে পান করান। অতঃপর অবশিষ্ট শরবত অন্যান্যদের বিনাইয়া দেওয়া হয়।'

আপন পৌত্রের সাথে উক্তরূপ আচরণের মাধ্যমে হয়রত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.), প্রশংসনীয় কাজের জন্য শিশু-কিশোরদের পুরস্কৃত করে ভাল কাজে উৎসাহ যোগানোর দীক্ষার সাথে সাথে এ শিক্ষাও দিয়েছেন যে, শিশু-কিশোরদের সাথে এমন ব্যবহারই করতে হবে, যাতে তারা লজ্জা-শঙ্কামুক্ত হয়ে প্রফুল্ল চিত্তে বড়দের সংস্পর্শে শিষ্টাচার রপ্ত করতে পারে।

বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থের 'ছফী সভ্যতার দিশারী' শীর্ষক অধ্যায়ে বিবৃত, 'পূর্ব আজিমগার নিবাসী মৃত তমিজ উদ্দীন মিঞাজীর পুত্র কালো মিঞা বর্ণনা করেন, আমি ছোটকালে একদা হয়রত সাহেব কেবলার হজরা শরীফে গিয়া দেখি যে, অত্র এলাকার কতক লোক, হয়রত কেবলার নিকট পরনের কাপড়, টুপী, ঘর মেরামত করার সাহায্য ইত্যাদি যে যার ইচ্ছানুযায়ী সাহায্য চাহিতেছে। দয়ার সাগর হয়রত সাহেব, হাজতী-মকছুদী লোকদের আনীত টাকা-পয়সা এবং বিভিন্ন সামগ্রী যে যা চাহিতেছে, দান করিতেছেন। আমিও উৎসাহিত হইয়া আমার মাথার টুপীটা কোমরের কাপড়ে গুজিয়া রাখিয়া বলিলাম, হযর আমার টুপী নাই। হয়রত কেবলা উত্তরে বলিলেন, 'আমরা ছোটকালে মাঠে খেলিবার সময় বাতানে টুপী উড়াইয়া নিতে চহিলে উহা নিজ কোমরে গুজাইয়া রাখিতাম'। ইহা শুনিয়া আমি লজ্জিত হইলে, তিনি আমার হাতে টাকা দিয়া বলিলেন, 'এবল যাও'।

এখানে হয়রত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা) গল্পছলে ও আচার-আচরণে অতিসুন্দর আদর্শের দীক্ষা দিলেন। কোনরূপ তিরস্কার-ভর্ৎসনা-দোষারোপ ছাড়া নিজের শৈশবের কথা বলে শিশু কালো মিঞার অন্তরে ছলচাতুরী ও মিথ্যার জন্য লজ্জাবোধ জাগিয়ে তুলেছেন। অতঃপর অহেতুক আঙ্গারের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় আদার করা ও পুরণে উত্থুদ্ধ করে টাকা দিয়ে সন্মুখে বিদায় করেন।

মানসিক ওৎসস্পন্ন আদর্শ প্রজন্ম তৈরিতে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা)র আদর্শ অনুসরণে নিশ্চিৎ সফলতা পাওয়া যাবে। তাই সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান রইল যে, আসুন আমরা তাঁর মহান আদর্শে আপন জীবন গড়ার ব্রত নিই।

ইয়াহুদী হে নসারা হে হাকীকত মে বহী কমবখ্ত জিসে গাউসে খোদা সে কুছ বদিল ইনকার হুজাবে

বোরহান উদ্দীন মুহাম্মাদ শফিউল বশর

মকবুলে বারগাহে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী, বাহুরে উলুমি আসরারে জবাবী, আবুল বরাকত হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আবুল গনী আছাফী আল্ মকবুল কাঞ্চনপুরী রহমতুল্লাহিল বারী'র গযলের উক্ত কলি শিরোনাম করে তদালোক অল্প-সল্প আলোচনার প্রয়াস পাবো। প্রথমে কলিটির অনুবাদে প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

‘ইয়াহুদ বা নাসারা মুলে সে-ই ণগাহত,
গাউসে খোদায় যার টুক মনোযুগা হবে।’

‘কুছ বদিল ইনকার’ বা সামান্যতম আন্তরিক ঘৃণা-অস্বীকার হেতু দু'কূল বরবাদ হওয়ার দু'টি ঘটনা আঙ্গিনায়ে বারী গ্রহে ‘দর বয়ানে মনলুবুল বিলায়ত হুজানে এক অলিয়ে মশহুর কে’ ও ‘দর বয়ানে মনলুবুল বিলায়ত হুজানে এক অলিয়ে সাহেবে কারমাত কে’ শিরোনামে বিবৃত। উক্ত গ্রন্থের বর্ণনা মতে ওই দুইজনই ছিলেন বড় মাপের অলিয়ুল্লাহ। অপর দিকে গাউসুল আ'যম (রা.)'র প্রতি আন্তরিক ভক্তি-বিশ্বাস হেতু এক হিন্দু বারহইয়ের মরনকালে স্বতঃস্ফূর্ত কালিমা-ই শাহাদত ও তৌহীদ পাঠ এবং আগ্নিদগ্ধ করতে না পারার ঘটনাও একই গ্রন্থে সবিস্তারে বিবৃত।

একদিকে ঘৃণা হেতু অলির বিলায়ত যাওয়া অপরদিকে ভক্তিতে হিন্দুর ঈমান পাওয়া; উভয় দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও শিক্ষণীয়। অন্যথায় ঈমান-আমল অজ্ঞাতেই যাবে রসাতলে। ‘আন তাহবাত্বা আ'মানকুম ওয়া আনতুম লা তাশুউরান’।

কুছ বদিল ইনকার বা সামান্যতম আন্তরিক ঘৃণা বিভিন্ন পর্যায়ের হতে পারে। (ক) বিলায়ত স্বীকার করে বিশেষ শানকে অস্বীকার করা, (খ) বিশেষ শানসহ বিলায়ত স্বীকার করে অধঃস্থ কাউকে সমকক্ষ মানা ইত্যাদি-ইত্যাদি। আমরা দ্বিতীয় তথা তুলনামূলক লম্বা পর্যাযটির পরিণতি নিয়ে আলোচনায় মনোনিবেশ করছি।

প্রথমে এমন এক প্রসিদ্ধ মাওলানার দ্রষ্টব্য নিমজ্জনের চিত্র তুলে ধরবো, যিনি নানা স্ববিরোধী বক্তব্যের মাধ্যমে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রা.)'র অধঃস্থ এক মহান সত্তাকে গাউসুল আ'যম প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। গাউসুল আ'যম শাহানশাহে বাগদাদ (রা.) কর্তৃক তুল্য সমকক্ষ বন্ধু এবং গাউসুল আ'যম শাহানশাহে মাইজভাণ্ডার (রা.) কর্তৃক ভাই ও সোনালী অক্ষরে নাম লেখা থাকার

মোষণার মাধ্যমে সমকক্ষতার বলিষ্ঠ প্রমাণকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজের দুর্ভাগ্য তেঁকে এনেছেন। তার দুর্ভাগ্যের কিছু নিদর্শন নিম্নে হুবহু উপস্থাপিত হল।

১. “নবুয়তের প্রধামাবস্থা” রূহে হাযওয়ানী” ও “রূহে ইনছানী” সংশ্লিষ্ট সলীম শক্তিশালী মানব রত্নুল্লাহ (দঃ) এর পক্ষে অসীম শক্তিমান “কুছল কুদদেহর” বা জিব্রাইল (আঃ) অথবা আত্মাহ তাআলার “হিফতে জিব্রাইলী”র সহিত রূহের সংযোগ সাধন পূর্বক “ওয়াহী” গ্রহণ করা মহা কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। পরম কাকলিক আত্মাহ তাআলা খাছ রহমত করিয়া তাঁহার “লতিফা” সমূহকে উন্মুক্ত ও প্রসারিত করিয়া ওয়াহী গ্রহণ তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য করতঃ তাঁহা হইতে মহা ভারী বোঝা অপসারণ করিয়াছিলেন।”

২. ‘বস্তবিক আত্মাহ তাআলার সহিত দাস ও মনিবের ন্যায় যাহাদের সৰ্ব্ব তাহার সম্পূর্ণ পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আত্মাহ তাআলার অনুগ্রহ বা বেহেছ লাভের সম্পূর্ণ আশা করিতে পারেনা। কারণ আত্মাহ তাআলার সম্যক দাসত্ব সমাধা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কাজেই সমুদয় পাশ কাজ হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকেও মানুষের সাধ্যাতিত। কোন নবী (আ.)-ও অনিচ্ছাকৃত পাশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। যেমন হজরত মুছা (আ.) নরহত্যা করিয়াছিলেন, আমাদের রত্নুল্লাহ (দঃ)-এর শানে ছুরা-আবাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল ইত্যাদি। যখন আত্মাহ তাআলার পূর্ণ দাসত্ব সমাপন করা বা সমুদয় পাশ হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকা মানুষের সাধ্যাতিত, তখন মানুষ মাদ্রেই আত্মাহ তাআলার নিকট অপরাধী।’

৩. “জিহমে থাক আয এশকে বর আফলাকে শোদ
কোহে দর রকুছ আমাদ ও চালাকে শোদ”

(জিহমে থাক) মাটির শরীর- এই স্থলে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ও হজরত ইছা (আ.) কে বলা হইয়াছে।

অনুবাদ: “মাটির শরীর [হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও হজরত ইছা (আ.)] এশকের দ্বারা আছামানে আরোহন করিয়াছেন এবং কোহেতুর বা সীনা পর্বত প্রেমানন্দে নৃত্য পরায়ন হওয়ায় আত্মাহ তাআলার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে।”

হজরত ইছা (আ.) ও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) উভয়েই মানুষ সুতরাং মাটির দেহ বিশিষ্ট। কিন্তু এশকের উৎকর্ষের দ্বারা হজরত ইছা (আ.) জীবিত অবস্থায় সশরীরে চতুর্থ আছামানে এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জ্ঞাপ্তাবস্থায় সশরীরে সত্তম আছামান, আরশ, কুরসি, স্থান, কাল, ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া আত্মাহ তাআলার অতি নিকটে গমন করতঃ তাঁহার সহিত নব্বই হাজার কালাম করিয়া বেহেছ দোজখ ইত্যাদি পরিদর্শন করতঃ মুহূর্তের মধ্যে নিজ শয্যায় ফিরিয়া আসিলেন,

যাহাকে 'মৈ'রাজ শরীফ বলা হয়। হজরত মুহা (আ:) সীনা পর্ষতে গিয়া আল্লাহুতআলার দর্শন প্রার্থী হইলে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছিলেন- 'তুমি কখনও আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবেনা, কিন্তু তুমি (সীনা) পাহাড়ের দিকে তাকাও। যদি পাহাড়ের স্থান বা অস্তিত্ব টিকিয়া থাকিতে পারে, তবে শীঘ্রই তুমি আমাকে দেখিবে।

পাহাড় আল্লাহুতআলার এই পবিত্র বাণী শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে নাটিয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর পাহাড়ের উপর আল্লাহুতআলা জলওয়া বা জ্যোতিঃ বিকাশ করিলেন। তাই, সীনা পর্ষতে পৃথিবীর যাবতীয় পর্ষতে হইতে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদা সম্পন্ন হইল।"

উক্ত বক্তব্য সম্পর্কে কোন মন্তব্যই আমরা করবোনা। শুধু বলবো, গাউসুল আ'যম কুতবুল আক্বাম হযরত শাহসুফী সৈয়দ আহমদুল্লাহ মাইজভাতারী (রা.)'র শানে ঐক্যতোর পরিণতি এমনই হয়।

"খমবকত ইসেহী কাহতা হে, খমবতী এসগাহী হুতাহে,
বসববে আদ্বাপন স্রেক ইয়ে নয়রৌ সে উবল রেহতী হে।"

'দুর্ভাগা ইহাকেই বলে, দুর্ভাগ্য এমনই হয়,
অন্ধত্ব হেতু কেবল ইহা দৃষ্টির আড়ালে রয়।"

এবার আমাদের সমকালীন এক মাজলানার বক্তব্যও একটু লক্ষ্য করুন, যিনি পূর্বোক্ত মাজলানার চর্চিত তুগের জাবর কেটেছেন।

"তাই আল্লাহুতায়লা "আল ইয়াওয়া আকমালতু লাকুম ধীনা'কুম, ওয়াতমামতু আলাইকুম নি'মাতী ... বলা সত্ত্বেও নবী (দ.)'র সাহাবীরাও পরবর্তী ওলামা, ফকিহ, বুর্জানেদ্বীনগণ ধীন ধর্মের চাহিদাকে পূর্ণতা দান করবেন।"

উক্ত বক্তব্য আল্লাহুতায়লা কর্তৃক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র মাধ্যমে ধীনে ইসলামের পরিপূর্ণতাদানের অস্বীকৃতি দৃষ্ট বিষয় অজ্ঞাতেই ঈমান-আমল বিনেষ্ঠের সুস্পষ্ট নিদর্শন কিনা বিবেচ্য। পরিশেষে আপন ঈমান-আমল রক্ষায় 'কুছ' বদিল 'ইনকার' বা সামান্যতম আন্তরিক ঘৃণা-অস্বীকারের পথ পরিহারের উদাত্ত আহ্বান রহিল।

'তরফদারীর ঢশমা খুলে দেখ ওহে বন্ধু সকল,
যুরছে ঘূর্ণি মূর্খতার মাচ্ছে স্বপন রসাতল।'

উল্লেখ্য যে, কারো ব্যক্তিত্ব প্রশংসিত করার অনীহা হেতু উদ্ধৃতি সমূহের তথ্যসূত্র সন্নিবেশনে নিবৃত্ত রইলাম। এ আন্তরিকতাকে দুর্বলতা না ভাবার সনিনয় অনুরোধ রহিল।



সম্পাদনা ও প্রকাশনায় :

আঞ্জুমানে তৌহীদ বতোফায়লে রশীদ

হারুয়ালছড়ি দরবার শরীফ, ভূজপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।